মাসুদ রানা

হারানো মিগ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
বেলাল



মাসুদ রানা

হারানো মিগ

কাজী আনোয়ার হোসেন

রাশিয়া থেকে কেনা বাংলাদেশের চারটে মিগ-২৯ থেকে একটা নিখোঁজ হয়ে গেছে। কায়রোয় আত্মহত্যা করেছে ওটার পাইলট। কেন?

এথেন্সে ছুটে গেল মাসুদ রানা। মুফতি তমিজউদ্দিনের সাথে ওই লোকটা কে? চেনা চেনা লাগছে! তাবাসসুম আর শায়লা হঠাৎ দূরে সরে গেল কেন?

সাহারায় খোঁজ পাওয়া গেল প্লেনটার। রানা জানে না ওই প্লেন এবং ওকে নিয়ে কী ভয়ঙ্কর প্ল্যান এঁটে বসে আছে তমিজউদ্দিন আর আক্কেল আলি।

উদ্ধার পাওয়ার উপায় নেই, চোখে আঁধার দেখছে ও। দেশের সম্পদ এবং নিজের জীবন রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু কিভাবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা ৩৩০

হারানো মিগ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-7330-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-330
HARANO MIG
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই,
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-99 *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা *মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ *অশুভ প্রহর *কনকতরী *স্বর্ণখনি *অপারেশন ইজরাইল শয়তানের উপাসক।

এক

অচেনা গলায় নিজের নাম শুনে ঘুরে তাকাল মৌ। প্রথমে ভেবেছিল ভুল শুনেছে, কিন্তু না, ঠিকই শুনেছে। ওকেই ডাকছে এক লোক। বেশ লম্বা-চওড়া, থুত্‌নিতে মেহেদী রাঙানো ফ্রেঞ্চকাট্‌ দাড়ি—চেহারাটা দারুণ। হাসি-হাসি মুখ।

'আমাকে বলছেন?' বলল মৌ।

'হ্যাঁ,' এগিয়ে এলো লোকটা। 'তুমি শহীদের বোন মৌ না?'

'জ্বি, কিন্তু…'

'দেখেছ, ঠিকই চিনেছি তোমাকে!'

'কিন্তু আপনি…?'

'আমি? আমি শহীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ফয়েজ আহমেদ।'

লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বুলাল মৌ। কাবুলী ড্রেস পরে আছে সে, ছাই রঙের। পায়ে স্যান্ডেল শূ। বাঁ হাতে মোবাইল ফোন। বয়স ওর দাদার মতনই হবে লোকটার, কিন্তু…

কেমন একটু সন্দিহান হয়ে উঠল মৌ। 'ফয়েজ আহমেদ? কিন্তু এই নামে দাদার কোন বন্ধু আছে বলে তো শুনিনি!'

শব্দ করে হেসে উঠল আগন্তুক। 'শুনবে কী করে? আমি অনেকদিন হলো দেশে থাকি না, রাশিয়ায় থাকি।'

'অ্যাঁ?' বিস্মিত হলো মৌ। 'রাশিয়ায় থাকেন?'

মাথা দোলাল যুবক। 'হ্যাঁ। মস্কোয় ছোটখাট একটা ব্যবসা

করি। গত সপ্তায় তোমার দাদা এসেছিল আমার অফিসে।'

বাতাসে কপালে উড়ে আসা কিছু চুল সরিয়ে দিল কিশোরী। বয়স চোদ্দ ওর, গুলশানের নামকরা এক স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। দুনিয়ায় এই দাদাটি ছাড়া আপনজন কেউ নেই। বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের ফাইটার পাইলট সে, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শহীদুল্লাহ্। গত তিন মাস ধরে রাশিয়ার কোবিয়াকোভায় বিশেষ ট্রেনিঙে আছে সে।

'দাদা গিয়েছিল আপনার অফিসে?' অস্থির হয়ে উঠল মৌ। আগন্তুক সম্পর্কে সমস্ত সন্দেহ উবে গেছে মুহূর্তে।

'হ্যাঁ। সারাদিন ছিল,' কাছের একটা বেঞ্চ দেখাল যুবক। 'চলো, বসে কথা বলি।'

মাঝে হাত তিনেকের ব্যবধান রেখে বসল দু'জনে। যুবক এদিক ওদিক তাকাল। 'দুই বান্ধবী ছিল না তোমার সঙ্গে? ওরা কোথায়?'

দু'চোখ সামান্য বিস্ফারিত হয়ে উঠল কিশোরীর। 'আপনি জানলেন কী করে সে-কথা?'

হাসল সে। 'শহীদ আমার ঘাড়ে কিছু গিফট চাপিয়ে দিয়েছিল তোমার জন্যে, ওগুলো পৌঁছে দিতে তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি তুমি নেই। এক বয়স্কা মহিলা আছেন শুধু।'

'উনি আমাদের ফুপু হন,' মৌ বলল।

'সে আমি দেখেই বুঝেছি,' মাথা দোলাল যুবক। 'শহীদ বলেছে ওনার কথা। উনি বললেন, দুই বান্ধবীসহ তুমি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে এসেছ। তাই...' ইচ্ছে করে থেমে গেল। একটু বিরতি দিয়ে বলল, 'কোথায় ওরা?'

'আইসক্রীম আনতে গেছে,' নড়েচড়ে বসল মেয়েটি। 'এসে পড়বে এখনই। আপনি দাদার কথা বলুন, প্লীজ!'

মুচকে হাসল যুবক। 'খুব অস্থির হয়ে উঠেছ ওর কথা শোনার জন্যে?'

'হব না? বলেন কী! তিন মা-স হলো দাদাকে দেখি না। মনে হয়, তিন যুগ হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যে টেলিফোন অবশ্য করে, চিঠিও লেখে। কিন্তু তাতে কি আর...' লোকটাকে পকেট থেকে কিছু বের করতে দেখে থেমে গেল মৌ।

একটা মুখ বন্ধ খাম বের করল সে। এগিয়ে দিল। 'শহীদের চিঠি পড়ো।'

এমন ব্যগ্রতার সাথে খামটা নিল মৌ, যেন ওটা মহামূল্যবান কিছু। উল্টেপাল্টে দেখল। 'পড়ছি। আগে বলুন...'

'উঁহুঁ!' মাথা নাড়ল ফয়েজ আহমেদ। হাসছে মিটিমিটি। 'আগে কাজ, পরে কথা। তোমার গিফট্গুলো ফুপুর হাতে দিয়ে এসেছি আমি। কিন্তু চিঠিটা দিইনি, কারণ ওটার জবাব এখনই মুখে মুখে আমাকে জানাবে তুমি।'

'এত জরুরী!' বিড়বিড় করে বলল মৌ।

'হ্যাঁ। আমি খুব অল্প সময়ের জন্যে দেশে এসেছিলাম। আগামী কাল ফিরে যাচ্ছি।'

'ও-ও, তাই?' খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করল ও। তখনই একটা মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ পেল নাকে, কিন্তু খেয়াল করল না। ব্যস্ত হয়ে পড়তে লাগল। সন্ধে হয়ে এসেছে, তারওপর লেখাগুলো গুঁড়ি-গুঁড়ি বলে কাগজটা চোখের কাছে ধরে পড়তে হচ্ছে মৌকে।

কিন্তু কী পড়ছে, নিজেই জানে না। গন্ধটা আরও জোরাল হয়ে উঠেছে, মাথা ঝিম্-ঝিম্ করছে ওর। এক মিনিট পর ফয়েজ আহমেদের সঙ্গে হেঁটে গিয়ে তার গাড়িতে উঠে বসল মৌ।

পার্কিং লট ছেড়ে রাস্তায় উঠে পড়ল গাড়ি, দ্রুতগতিতে বারিধারার দিকে ছুটল। ফয়েজ আহমেদ ড্রাইভ করছে।

দুই

ক্ষোবিয়াকোভা এয়ারফোর্স বেস, জাগরস্ক। মস্কো থেকে চল্লিশ মাইল দূরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক সামরিক স্থাপনা। খুব ব্যস্ত। অতীতে আরও বেশি ব্যস্ত ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ায় কিছুটা কমেছে। তার বদলে অবশ্য গুরুত্ব অনেক বেড়েছে মস্কোর সবচেয়ে কাছের এয়ারফোর্স বেস বলে।

মূল বেসের সামান্য দূরে অফিসার্স মেস। দেশী পাইলটরা তো থাকেই, বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিতে আসা পাইলটরাও থাকে এখানে। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা রূম।

বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের পাইলট, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শহীদুল্লাহ্‌র রূমটা বেসের একদম দক্ষিণ মাথায়। রূমের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সে এ-মুহূর্তে। পর্দা সরিয়ে অপলক চোখে রাতের অন্ধকার আকাশ দেখছে। নিজের মাঝে নেই সে। কপালে চিকন ঘাম।

পাশে, বেডের ওপর পড়ে আছে একটা মুখ খোলা খাম, কিছু ছবি, একটা চিঠি ও একটা ক্যাসেট। সারাদিনের হাড়ভাঙা ট্রেনিং শেষে বেসে ফিরে খামটা পেয়েছে সে, অর্ডারলি বন্ধ দরজার নিচ দিয়ে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে গেছে কখন কে জানে!

চারটে ছবি আছে খামে, সবগুলোই তার ছোট বোন মৌয়ের। চিঠিটাও ওরই হাতে লেখা। আর ক্যাসেটে রেকর্ড করা আছে ওর

আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর, এবং অচেনা এক পুরুষ কণ্ঠের কিছু নির্দেশ। চিঠিটা অনেকবার করে পড়েছে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, ক্যাসেটটাও অনেকবার করে বাজিয়ে শুনেছে, তারপরও চেহারা ভাবলেশহীন। দেখে মনে হয় না ওগুলোর বক্তব্য বুঝতে পেরেছে ও।

আসলে ঠিকই বুঝতে পেরেছে। পেরেছে বলেই মনে মনে মরে গেছে শহীদুল্লাহ্। মাথা কাজ করছে না। হাত-পা অসাড়। নড়তে পারছে না। বাইরে প্রচণ্ড শীতে আড়ষ্ট হয়ে আছে কোবিয়াকোভা, অথচ সে ঘামছে। ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে চাইছে।

অনেকক্ষণ পর সংবিৎ ফিরে পেল ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, পর্দা ছেড়ে চিঠিটা তুলে নিল। ওতে মৌ লিখেছে: দাদা, ওরা আমাকে আটকে রেখেছে। ওরা কারা জানি না। তুমি ওদের নির্দেশমত কাজ না করলে আমাকে মেরে ফেলবে। দাদা, আমার খুব ভয় করছে। আমাকে বাঁচাও!

অধিক শোকে পাথর মনটা অবশেষে গলতে শুরু করল, কেঁদে ফেলল পাইলট। টপ্-টপ্ করে দু'ফোঁটা পানি ঝরে পড়ল চিঠির ওপর। বুকের ভেতরে অসহ্য এক অনুভূতি হচ্ছে। একটা মস্ত বুলডোজার নেচেকুদে বেড়াচ্ছে যেন ওখানে। সবকিছু ভেঙেচুরে একাকার করে দিচ্ছে। চোখের পানির বন্যার মধ্যে মৌয়ের কচি মুখখানা ভাসছে, দুলছে ছোট ছোট ঢেউয়ের দোলায়।

চিঠি রেখে ছবিগুলো তুলে নিল সে, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল, পানিতে ভিজে একাকার হয়ে গেল ওগুলো। বিড়বিড় করে কী সব বলতে লাগল পাইলট। একটুপর চোখের পানি মুছে কাছেই টেবিলে রাখা ক্যাসেট প্লেয়ারের 'প্লে' বাটন টিপে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল কণ্ঠটা—ভরাট, গম্ভীর।

'ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শহীদুল্লাহ্,' বাংলায় বলছে ওটা, 'আজ

রাত দশটায় কোবিয়াকোভা, রেল টার্মিন্যাসের দোতলার রেস্টুরেন্টে থাকবেন। সিভিল ড্রেসে। অন্যথা হলে মৌকে হারাবেন।'

কারা ওরা? সেট অফ করে ভাবল পাইলট, তার কাছে কী চায়? কী পাওয়ার আশায় ওর ছোট্ট বোনটাকে ধরে নিয়ে গেছে? ওদেরকে দেয়ার মত এমন কী আছে তার?

ঘণ্টাখানেক আগে খামটা পেয়েছে শহীদুল্লাহ্। প্রথমে বিশ্বাসই হতে চায়নি ব্যাপারটা। ভেবেছিল কেউ বুঝি ঠাট্টা করেছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে একটু পর ঢাকায় ফোন করে সে, ভাইপোর গলা শুনে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন ফুপু। ওর মধ্যে কথা যে ক'টা বলতে পেরেছেন, বুঝতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে তাকে। তার সারমর্ম হচ্ছে:

চারদিন আগে দুই বান্ধবীর সাথে গুলশানের ওয়ান্ডারল্যান্ডে বেড়াতে গিয়েছিল মৌ, আর ফিরে আসেনি। বান্ধবীরা বলছে, মৌকে তারা অচেনা এক লোকের সাথে তার গাড়িতে উঠতে দেখেছে দূর থেকে। অনেক ডাকাডাকি করেছে মেয়ে দুটো, শোনেনি মৌ। তাকায়ওনি ওদের দিকে। পুলিসসহ সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থা হন্যে হয়ে খুঁজছে মৌকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্যাপারটা কোন ঠাট্টা নয়, বরং নির্মম সত্য, বুঝতে পেরে তখনি মনে মনে মরে গেছে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। দুনিয়ায় ওই বোনটি ছাড়া আপন বলতে আর কেউ নেই তার। বারো বছরের ব্যবধান ওদের বয়সের। মৌয়ের পাঁচ বছর বয়সে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মা-বাবার মৃত্যু হয়, সেই থেকে বলতে গেলে সে-ই কোলেপিঠে করে বড় করেছে ওকে।

শহীদুল্লাহ্র দুনিয়া একদিকে, মৌ আরেকদিকে। ছায়ার মত আগলে আগলে রেখেছে সে ওকে। মৌ একটা হাঁচি দিলেও জান উড়ে যেত ওর। ওকে মাটিতে হাঁটতে দেখলে কষ্ট হত, ইচ্ছে হত

বুক পেতে দেয়। মস্কো আসার আগের রাতেও গল্প বলে মৌকে ঘুম পাড়িয়েছে সে। তার এত আদরের সেই বোনটি এখন কোথায়, কী অবস্থায় আছে, ভাবতে গিয়ে উন্মাদ হওয়ার অবস্থা ফ্লাইট লেফটেন্যান্টের।

কেন? অপ্রকৃতিস্থের মত টেনে টেনে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল সে। ওর কলজের টুকরো বোনটাকে কেন তুলে নিয়ে যাওয়া হলো? কারা করল এমন কাজ? কী চায় ওরা?

নির্দিষ্ট সময়ে ডিনার গঙের দূরাগত আওয়াজ শুনল সে, কিন্তু উঠল না। বসে আছে তো আছেই। একটু পর অফিসারদের উঁচু গলার কথা, হাসির শব্দও কানে এল, ডিনার খেতে মেসে জড় হচ্ছে তারা। গ্লাস, প্লেট, চামচের টুং টাং অস্পষ্ট শব্দ আসছে। হঠাৎ দরজায় জোরে জোরে নক্ হতে চমকে উঠল সে।

'শহীদ! তুমি রেডি?' ফ্লাইং অফিসার নিয়াজের গলা ওটা, আরেক বাংলাদেশী ফাইটার পাইলট। পাশের রুমে থাকে। মেসে যাওয়ার সময় প্রতিবার তাকে ডাকে। সিনিয়র অফিসার বলে কোনরকম দেমাগ নেই মানুষটার মধ্যে।

'একটু দেরি হবে, সার,' জবাব দিল শহীদুল্লাহ্। 'আপনি চলে যান, আমি আসছি।'

'নাহ্, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না,' হাসির সাথে কপট বিরক্তি প্রকাশ পেল তার বিলীয়মান কণ্ঠে। 'গর্তে একবার ঢুকলে আর...'

বিষণ্ন এক টুকরো হাসি ফুটল ফ্লাইট লেফটেন্যান্টের মুখে। কেন হাসল জানে না। উঠে পড়ল। যত অনিচ্ছাই থাকুক, মেসে না গিয়ে উপায় নেই। দেরি দেখলে বাকি দুই পাইলটও এসে হাজির হবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

এ-মুহূর্তে সে সহ চারজন বিএএফ পাইলট ও কয়েকজন গ্রাউন্ড ক্রু আছে এখানে। রাশিয়ার কাছ থেকে নতুন চারটে মিগ-

২৯ কিনেছে বাংলাদেশ, ওগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছে তারা। যন্ত্রগুলো খুবই জটিল, পাক্কা তিন মাস লেগেছে ফ্লাইং শিখতে। কাজ শেষ, এখন বাকি আছে শুধু তিনদিনের সোলো প্র্যাকটিস। ইন্সট্রাক্টর ছাড়া একা উড়তে হবে। তারপরই দেশে ফিরে যেতে পারবে দলটা।

হাতে গোনা কয়েকজন বাঙালী, তার মধ্যে একজন অনুপস্থিত থাকলে অন্যরা খোঁজ নিতে আসবেই, কাজেই সময় নষ্ট করার ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। সমস্যায় পড়ে যেতে পারে শহীদুল্লাহ্। অ্যাটাচড্ বাথ থেকে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখল।

দীর্ঘদেহী সে, প্রায় ছয় ফুট লম্বা। স্লিম। একটু লম্বাটে মুখ, খাড়া নাক। থুতনিতে খাঁজ আছে। ভাসা ভাসা চোখ, কান্নার ফলে এ মুহূর্তে একটু ফোলা ফোলা লাগছে। আরও কিছুক্ষণ চোখে পানি ছিটাল সে, তারপর তোয়ালে দিয়ে ডলে ডলে মুখ মুছল। চুল আঁচড়ে আরেকবার ভাল করে দেখল নিজেকে। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। বোনের ছবিগুলো পকেটে ভরল, ক্যাসেট আর চিঠিটা খামে রেখে ওটা বালিশের তলায় গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে এলো সে রুম থেকে।

কিছুই খেল না সে, রুচি নেই। শুধু ছুরি-কাঁটা-চামচ নাড়াচাড়া করে কাটাল। রুমে ফিরে সময় হওয়ার অপেক্ষায় অস্থির পায়ে পায়চারি করতে থাকল ঘরময়।

ঠিক ন'টায় বের হলো সে, ডিউটি অফিসারের কাছ থেকে জরুরী কেনাকাটার কথা বলে দু'ঘন্টার ছুটি নিল, গ্যারেজ থেকে নিজের ঝক্কর মার্কা মস্কোভিচ বের করে ছুটল চার মাইল দূরের রেল টার্মিনাসের উদ্দেশে।

সাড়ে ন'টায় নির্দিষ্ট রেস্টুরেন্টে পৌঁছল শহীদুল্লাহ্। একটা খালি টেবিল দেখে বসে পড়ল। সঙ্গে নিয়ে আসা সেদিনের একটা

দৈনিক পত্রিকা মেলে ধরে পড়ার ভান করতে লাগল। মস্কো-কোবিয়োকোভা-মিনস্কগামী মেইল ট্রেন একটু পর ইন করবে, প্রচুর যাত্রী আছে ওটার অপেক্ষায়। তাদের বেশিরভাগই রয়েছে এখানে, সময় কাটাচ্ছে কফিতে চুমুক দিয়ে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ভেতরটা প্রায় অন্ধকার।

একটু পর পর চোখ তুলছে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, আশপাশের সবাইকে দেখছে, প্রবেশ পথের দিকে তাকাচ্ছে। নীল ড্রেস পরা এক সোনালীচুলো যুবতীকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আড়ষ্ট হয়ে উঠল সে। অবশ্য পরক্ষণেই ভুল ভাঙল মেয়েটা ওয়েট্রেস বুঝতে পেরে।

'কিছু চাই তোমার, মিস্টার হ্যান্ডসাম?' তরল হাসির সাথে নিচু গলায় বলল যুবতী। 'ড্রিঙ্ক, ফুড, ফান?'

বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল সে। 'কফি, প্লীজ।'

'ওকে,' ভারী নিতম্বে অহেতুক ঢেউ তুলে ফিরে গেল যুবতী। কফি রেখে যাওয়ার সময় আরেকটা সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করল। মোহনীয় হাসি হেসে আগের মত নিচু গলায় বলল, 'দশটায় আমার ছুটি। কাছেই থাকি। যদি বিশেষ কিছু প্রয়োজন হয়...'

'গেট লস্ট!' চাপা কণ্ঠে ধমকে উঠল শহীদুল্লাহ্।

হোঁচট খেল যুবতীর হাসি, মাথা নিচু করে চলে গেল। সিগারেট ধরাল সে, ইচ্ছে করছে না, তবু কফিতে চুমুক দিল। উদ্বিগ্ন চোখে মানুষজনের আসা-যাওয়া দেখছে। দশটা বাজতে মেইল ট্রেনের দূরাগত হুইস্‌ল শোনা গেল। দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে এলো রেস্টুরেন্ট। চারদিক নজর বোলাল পাইলট। সে ছাড়া আর বড়জোর জনাছয়েক খদ্দের ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে ভেতরে। একদম ফাঁকা হয়ে গেছে ভেতরটা।

নিজেকে বোকা বোকা লাগছে শহীদুল্লাহ্‌র। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। সিগারেট শেষ করে অ্যাশট্রেতে ফেলে চোখ

তুলল সে, তখনই দেখতে পেল মেয়েটিকে। এ আরেক মেয়ে, প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে তাকেই দেখছে হাসিমুখে। গায়ের রং আর চেহারা দেখে এ দেশী মনে হলো না মেয়েটাকে।

টকটকে লাল রঙের কোট পরে আছে সে, বয়স সাতাশ-আটাশ। কাঁধ পর্যন্ত দীর্ঘ, চকচকে কালো চুল। গায়ের রঙ বেশ চাপা। চেহারাটা অবশ্য দেখার মত। কাঁধে বড় একটা চামড়ার ব্যাগ। এমনভাবে হাসছে, মনে হয় মুখের ভেতর হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলছে যেন। ভেতরে উপস্থিত প্রত্যেকে, এমনকি যুবতী ওয়েট্রেসও তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। নড়ে উঠল সে।

ব্যালে নর্তকীর মত পা ফেলে শহীদুল্লাহ্‌র দিকে এগিয়ে এল। চোখ ফিরিয়ে পত্রিকায় মন দিতে চাইল ও, হলো না। একদম ওর দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। 'হ্যালো!'

'হ্যালো,' মৃদু নড করল শহীদ। বিকট ঘটাং-ঘটাং শব্দে টার্মিনাসে ইন করল মেইল। কেঁপে উঠল যেন গোটা ভবন।

'বাই আ গার্ল আ ড্রিঙ্ক?' ইংরেজিতে বলল যুবতী। পরিচিত টানে, কিন্তু সেটা ধরতে পারল না ও।

'দুঃখিত, আমি একজনের অপেক্ষায় আছি।'

'কামন, ম্যান! আমিই তোমার সেই একজন,' নিঃশব্দে হাসল সুন্দরী। বসার উদ্যোগ নিল।

'তুমি!' চোখ কুঁচকে উঠল শহীদুল্লাহ্‌র। 'ইউ...

'শ্‌শ্‌শ্‌! আস্তে বলো, কেউ শুনে ফেললে তুমিই সমস্যায় পড়বে,' মুখোমুখি বসল সে। 'নাও, একটা সিগারেট দাও দেখি আমাকে। আর এমন ভাব দেখাও, যেন আমাকে পেয়ে খুশি হয়েছ। কামন, তোমার বোন ভাল আছে, সুস্থ আছে।'

সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। আবেগে, উত্তেজনায় কাঁপছে ওর হাত। 'ওর কিছু হলে তোমাদের একটাকেও ছাড়ব না আমি,' জানে এসব অর্থহীন, হাস্যকর

আস্ফালন, তবু নিজেকে সামলাতে পারল না সে। 'কেউ বাঁচবে না তোমরা।'

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে হাসল মেয়েটা। চেয়ার একটু পিছিয়ে নিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসল। 'সে-সবের প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না'। যাক্‌গে, একটা বিয়ারের অর্ডার দাও আমার জন্যে। তারপর এসো, কথা বলি আমাদের দাবির ব্যাপারে।'

ইশারায় ওয়েট্রেসকে ডাকল শহীদুল্লাহ্, অর্ডার দিয়ে ঝুঁকে বসল। হুইস্‌ল্ বাজাল মেইল, ছেড়ে যাচ্ছে। 'কে তুমি?'

'সেটা তোমার না জানলেও চলবে,' শ্রাগ করল মেয়েটা।

'ঠিক আছে। কাদের প্রতিনিধিত্ব করছ তুমি?'

মুচকে হাসল যুবতী। 'ক্লাসিফায়েড তথ্য। বলা যাবে না।'

রেগে উঠতে লাগল পাইলট, কিন্তু নিজের অসহায়ত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে, তাই সামলে নিল। 'আমার বোনকে কেন ধরে নিয়ে আটক করা হয়েছে? কি চাও তোমরা, টাকা?'

'না, টাকা আমাদের যথেষ্ট আছে।'

'তাহলে?' আরেকটু ঝুঁকল পাইলট। 'আর কী আছে আমার দেয়ার মত?'

'প্লেন আছে।'

'কী?' চোখ কুঁচকে উঠল ফ্লাইট লেফটেন্যান্টের।

বিয়ার নিয়ে ওয়েট্রেসকে আসতে দেখে মুখ খুলেও শেষ সময়ে থেমে গেল যুবতী। ধীরেসুস্থে বিয়ারে চুমুক দিল। ওর দেরি দেখে অস্থির হয়ে উঠল সে। 'কিসের কথা বলছিলে?'

মুখে মধুর হাসি ফোটাল সুন্দরী। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তুমি পাইলট, কোবিয়াকোভা বেজে মিগ-২৯ চালনার ট্রেনিং সবে শেষ করেছ, রাইট?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি জানলে কী করে?'

'বাংলাদেশ চারটে মিগ-২৯ কিনেছে রাশিয়ার কাছ থেকে,

জবাব না দিয়ে বলে চলল সে। 'ওগুলো দেশে নিয়ে যাবে তোমরা চার পাইলট। এখন শুধু তিনদিনের সোলো প্র্যাকটিস বাকি, ঠিক?'

'এত খবর কী ভাবে জানলে তুমি...মানে, তোমরা?' বিস্ময়ে চোখ সামান্য বিস্ফারিত হয়ে গেছে শহীদুল্লাহ্‌র।

'তা জেনেও কোন লাভ হবে না তোমার,' সিগারেট অ্যাশট্রেতে ডলে নেভাল মেয়েটা, পূর্ণ চোখে ওর দিকে তাকাল। 'চলো, বাকি কথা বাইরে গিয়ে বলব।' এক ঢোকে বাকি বিয়ার গলায় ঢেলে উঠে পড়ল। 'লেট'স গো।'

'জাহান্নামে যাও!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে।

ঝুঁকে এলো সুন্দরী। 'লিসেন, মিস্টার শহীদুল্লাহ্,' সাপের মত হিসহিসিয়ে বলল, 'আমি যা বলব, এই মুহূর্ত থেকে ঠিক তাই করবে তুমি। আমার প্রতিটা নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে...যদি বোনকে জ্যান্ত ফেরত পেতে চাও। নইলে কাল অথবা পরশু একটা প্যাকেট আসবে তোমার ঠিকানায়। ওতে তোমার বোনের একটা কাটা হাত থাকবে। পরদিন আসবে আরেকটা...'

পাইলটকে চট্ করে উঠে পড়তে দেখে থামল মেয়েটা, হাসল মুখ টিপে। 'গুড বয়!'

ওর টুঁটি টেনে ছিঁড়ে ফেলার ঐকান্তিক ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে দমন করল শহীদ, বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলো রেস্টুরেন্ট ছেড়ে। 'কোথায় যেতে হবে?' প্রশ্ন করল ক্রুদ্ধ স্বরে।

'এই তো, কাছেই,' দু'হাত কোটের পকেটে ভরে তার সাথে সমান তালে পা চালাল মেয়েটি। বেশ ফাঁকা এখন টার্মিনাস, মেইল ট্রেন ছেড়ে যাওয়ায় ভিড় অনেক কমে গেছে। চওড়া মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো ওরা।

'তোমার গাড়ি কোথায়?' মেয়েটা প্রশ্ন করল।

'কেন?'

'কিছুক্ষণের জন্যে রোমান্টিক ড্রাইভে যাব তোমার সাথে।'

ঘড়ি দেখল শহীদ। 'কিন্তু আমার হাতে বেশি সময় নেই। দু'ঘণ্টার ছুটি নিয়ে এসেছি আমি।'

'ওতেই চলবে,' বলে চট্ করে ওর বাহু আঁকড়ে ধরল মেয়েটা। প্রায় ঝুলতে ঝুলতে চলল।

বিশাল ভবন থেকে বেরিয়ে কার পার্কে চলে এলো ওরা। এক মিনিট পর গাড়ি ছাড়ল শহীদুল্লাহ্। মেয়েটার নির্দেশিত পথ ধরে দশ মিনিট ছুটে হাইওয়ের পাশে একটা নদীর তীরে থামল। জায়গাটা একেবারেই নির্জন, দু'চার মাইলের মধ্যে কোন বাড়িঘরের আলো চোখে পড়ছে না। স্টার্ট অফ করে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর দু'হাত রেখে ঝুঁকে বসল ও। মেয়েটির অলক্ষে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টটা খুলল। ওটার মধ্যে আছে তার ফুল লোডেড সার্ভিস বেরেটা, যদিও জানে এ পরিস্থিতিতে ওটা ব্যবহার করার প্রশ্নই আসে না। সে উপায় নেই।

'জায়গাটা চমৎকার,' বলে উঠল যুবতী। 'নির্জন, রোমান্টিক, তাই না? তুমি চাইলে,' কোটের বোতামে হাত দিল। মুখে মৃদু হাসি।

'আমার বোন কোথায়?' কড়া গলায় বলল শহীদুল্লাহ্।

হাত থেমে গেল তার। শ্রাগ করল। 'বলেছি তো, ওকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই তোমার। ও ভাল আছে, খুব ভাল আছে। আমাদের দাবি মিটলেই...'

'কিসের দাবি? কী চাও তোমরা?'

'একটা প্লেন,' যুবতী নির্বিকার। 'তোমার মিগটা চাই।'

হতবাক হয়ে গেল শহীদুল্লাহ্, কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। তারপর কোনমতে বলল, 'কী বললে?'

'ঠিকই শুনেছ তুমি। বিশেষ প্রয়োজনে তোমার প্লেনটা

আমাদের চাই।'

'পাগল হয়েছ তোমরা!' অনেকক্ষণ পর দাঁতে দাঁত পিষে বলল সে।

'পৃথিবীর সবাই কম-বেশি পাগল, শহীদুল্লাহ্।' একটু বিরতি দিল মেয়েটা। 'আজ থেকে তিনদিন পর তোমাদের ট্রেনিঙের শেষ পর্যায়, অর্থাৎ সোলো প্র্যাকটিস শুরু হবে। রাতে। মাঝরাতে বেজ ছাড়বে তোমরা, লীডারের পিছনে থ্রী প্লেন ফর্মেশনে...'

'এত খবর তুমি জেনেছ কী করে!' বিস্ময়ের বাঁধ ভেঙে যেতে চেঁচিয়ে উঠল ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। 'হাউ দ্য হেল্...!'

মুখ তুলে ব্যঙ্গের হাসি হাসল যুবতী। 'আমরা এত বেশি কিছু জানি যে শুনলে মূর্ছা যাবে তুমি। এবার দয়া করে মুখে তালা মারো, বলতে দাও আমাকে। তুমি থাকবে তৃতীয় সারির বাঁ দিকে। আকাশে উঠে সোজা দক্ষিণে যাবে তোমরা, ব্ল্যাক সী-র ওপর পৌঁছে ফর্মেশন ভেঙে প্র্যাকটিস শুরু করবে।' চোখ তুলে ওকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসল যুবতী। ভুরু নাচাল। 'কী, ঠিক বলেছি?'

জবাব দেয়া দূরে থাক, চোখের পাতাও নাড়াতে ব্যর্থ হলো ও। বিস্ফারিত চোখে মেয়েটাকে দেখছে তো দেখছেই।

ডানদিকের চুল কানের পিছনে গুঁজল যুবতী। 'ব্ল্যাক সী-র ওপর পৌঁছে প্লেন নিয়ে সটকে পড়বে তুমি। আরও দক্ষিণে...'

'অসম্ভব!' চেঁচিয়ে উঠল শহীদুল্লাহ্। 'মরে গেলেও এ কাজ আমাকে দিয়ে হবে না!'

'বেশ। কালকেই যাতে প্রথম প্যাকেটটা পৌঁছায়, সে ব্যবস্থা করব আমি।'

খুব দ্রুত হাত চালাল পাইলট, খপ্ করে গলা চেপে ধরল মেয়েটার। ধাক্কা মেরে ওপাশের দরজার ওপর নিয়ে ফেলল, রাগে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। 'এখন যদি আমিই তোকে প্যাকেট করে

ওদের কাছে পাঠাই?'

'বোকামি কোরো না, অফিসার,' কোনমতে বলল সে। 'আমি মরলে ওদের কিচ্ছু আসবে-যাবে না। কিন্তু একমাত্র বোন মরলে তুমি বাঁচবে কী নিয়ে?'

সামলে নিল পাইলট, ছেড়ে দিল ওকে। 'তোমরা···তোমরা অমানুষ!' অসহায় রাগে চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি আমার দেশের সাথে বেঈমানী করতে পারি না।'

'সরি,' যুবতী বলল। 'আমি যদি আজ ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাই, তাহলে তার ফল কী হবে নিশ্চই বুঝতে পারছ তুমি?'

কিছুক্ষণ অসহায়ের মত তার দিকে তাকিয়ে থাকল ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। মাথার মধ্যে হাজারো চিন্তা চলছে, কিন্তু সবই এলো মেলো। মনে হচ্ছে শূন্যে ভাসছে সে, ঘুরপাক খেতে খেতে অন্ধকার টানেলের মধ্যে দিয়ে অজানার উদ্দেশে ভেসে চলেছে টানেলের শেষ মাথায় কী আছে জানে না। কী করবে না করবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না সে।

'তুমি রাজি, শহীদুল্লাহ্?' পরিষ্কার বাংলায় বলল এবার মেয়েটা।

চমকে উঠে মুখ তুলল সে, চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটার দিকে। 'তুমি বাঙালী!'

'না। বাংলাদেশী মুসলমান।' মাথা ঝাঁকাল যুবতী। 'সে যাক, তুমি আমাদের প্রস্তাবে রাজি?'

জবাব নেই। পলকহীন চোখে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে শহীদুল্লাহ্। বুকের ভেতরে মিশ্র অনুভূতির ঝড় বইছে।

'যদি রাজি থাকো, তাহলে একভাবে নিজেদের পরবর্তী কর্মপন্থা সাজাব আমরা, আর তা নইলে অন্যভাবে। আমার মতে তোমার রাজি হয়ে যাওয়াই ভাল, যদি মৌকে ফেরত পেতে

চাও।'

পাইলট নিরুত্তর। অনড়। হাসল যুবতী মনে মনে, লোকটা যে ভেতরে ভেতরে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে, তা বেশ ভালই বুঝতে পারছে সে। তার চেহারাতেই পরাজয় ফুটে আছে।

'আমরা জানি মৌকে কত ভালবাসো তুমি,' আবার বলল নরম গলায়। 'ওর কিছু হয়ে গেলে তুমি বাঁচবে না, তা-ও জানি। কাজেই রাজি হয়ে যাও। মিগ খোয়া যাওয়ার সাথে তোমার হাত আছে তা যাতে তোমার দেশ টের না পায়, তুমি যাতে দেশে ফিরে নির্বিঘ্নে কাজে যোগ দিতে পারো, তার সমস্ত ব্যবস্থা আমরাই করে দেব। কোন রকম অভিযোগ উঠবে না তোমার বিরুদ্ধে। সেই সাথে বোনকেও ফেরত পাচ্ছ। ভেবে দেখো।'

গাড়ির দরজা খুলে এক পা নামিয়ে দিল যুবতী। 'ভাল করে ভেবে সিদ্ধান্ত নাও। আটচল্লিশ ঘণ্টা পর আবার তোমার সাথে যোগাযোগ করব আমরা। মনে রাখবে, তোমার "হ্যাঁ" বা "না" নির্ধারণ করবে মৌয়ের ভবিষ্যৎ। আজকের মত চলি,' বেরিয়ে গেল সে। দড়াম করে লেগে গেল দরজা।

যতক্ষণ দেখা যায়, ঝাপ্সা চোখে যুবতীর দিকে তাকিয়ে থাকল শহীদুল্লাহ্।

পরের দুটো দিন হুঁশ ছিল না। ট্রেনিঙের এই পর্যায়ে পাইলটদের তিনদিনের ছুটি দেয়া হয়েছিল, দিনগুলো রীতিমত বিভীষিকার মধ্যে দিয়ে কাটল শহীদুল্লাহ্র। সতীর্থদের সাথেই থাকল সে উপায় ছিল না বলে। তাদের সাথে পার্টিতে অংশ নিল, কিন্তু মন তার পড়ে থাকল দূরে কোথাও।

মেয়েটার কথামত ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টা পর ডিউটি অফিসারের অফিসের নম্বরে ফোন এলো শহীদুল্লাহ্র। মেসের মুখোমুখি ছোট এক ভবনে সেটা। অফিসার সীটে নেই এ মুহূর্তে,

ফোনের রিসিভার সেটের পাশে রাখা। কাঁপা হাতে ওটা কানে লাগাল সে।

'ইয়েস?'

'ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শহীদ নাকি?' অচেনা এক পুরুষ কণ্ঠ বাংলায় বলল।

'বলছি।' পরক্ষণে ছোট বোনের কান্নাভেজা গলা শুনে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

'দাদা!'

'মৌ! তুই কোথায়, আপু?'

শব্দ করে কেঁদে উঠল মেয়েটা। 'জানি না, দাদা! এরা কারা, তাও জানি না।'

'ওরা তোকে মারধর করেনি তো?' অসহ্য আবেগে চোখে পানি এসে গেল শহীদুল্লাহ্‌র।

'না। কিন্তু...' কান্নায় বুজে এলো মৌয়ের গলা। 'ওরা বলছে আমার একটা হাত কেটে...' আঁতকে উঠে থেমে গেল সে।

'মৌ! মৌ! কী হয়েছে, আপু? কি...'

প্রথম কণ্ঠটা সাড়া দিল। 'তুমি আমাদের প্রস্তাবে রাজি?'

'কুত্তার বাচ্চা! বেশ্যার বাচ্চা!'

'সৌজন্য সম্ভাষণ পরে, শহীদুল্লাহ্,' লোকটা নির্বিকার। 'আগে বলো, তুমি রাজি কি না।'

জবাব দিল না পাইলট, শব্দ খুঁজছে।

'শহীদ! লাইনে আছ?'

'হ্যাঁ।'

'রাজি তুমি?'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'হ্যাঁ। বাস্টার্ডস।'

নাকে হাসল কলার। 'বুদ্ধি আছে তোমার। জরুরী কিছু আলাপ আছে, আধঘণ্টার মধ্যে রেল টার্মিনাসে চলে এসো।

ভেতরে ঢুকবে না, ওটাকে বাঁয়ে রেখে কিছুদূর এগিয়ে রাস্তার পাশে একটা ট্রাফিক সাইন দেখতে পাবে। ওখানে অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে।'

'কাকে খুঁজতে হবে?'

'তোমার কাউকে খুঁজতে হবে না,' হাসল লোকটা। 'আমরাই তোমাকে খুঁজে নেব চলে এসো।'

সময়মতই এলো লোকটা দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট ছয়ের মত হবে, তেল- তেলে, গোলগাল চেহারা গাল ভর্তি ঘন, কুচকুচে কালো দাড়ি বড় বড় চোখ, চাউনি চকচকে। একটা নীল টয়োটা সেডানে করে এসে রাস্তার অন্যপাশে নামল লোকটা, ভারী ওভারকোটের প্রান্ত বাতাসে উড়িয়ে দৃঢ়পায়ে এগিয়ে এল।

সেডানে ড্রাইভারসহ আরও দু'জনকে বসা দেখতে পেল শহীদুল্লাহ্। এদিকেই তাকিয়ে আছে। কিন্তু একে দূরে, তারওপর গাড়ির ভেতরে বসা, তাই তাদের চেহারা দেখতে পেল না সে। প্রথমজন এসে উঠে বসল তার পাশে। থুতনি তুলে দাড়ির ইশারায় সামনে দেখাল। 'চালাও। শহরের বাইরে গিয়ে কথা বলব আমরা।'

নীরবে গাড়ি ছাড়ল পাইলট, খেয়াল করল অন্য গাড়িটাও পিছু নিয়েছে। মাঝে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে আসছে ওটা। নীরবে গাড়ি ছোটাল শহীদুল্লাহ্, মাথার মধ্যে ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে। অর্থহীন সব চিন্তা। টানা দশ মিনিট চলার পর গাড়ি থামাতে বলল লোকটা। এটা সেই জায়গা, দু'দিন আগে মেয়েটা যেখানে নিয়ে এসেছিল শহীদুল্লাহ্‌কে।

স্টার্ট বন্ধ করে ঘুরে তাকাল ও। 'তোমরা কারা?' কঠিন গলায় বলল। 'কেন...'

'তোমার এইসব প্রশ্ন অর্থহীন,' বলল লোকটা। 'অতীত নয়,

তোমার আর তোমার বোনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করতে পারো তুমি, তাও এখনই নয়। পরে। আমার কথা শেষ হলে, ঠিক আছে?' ওভারকোটের পকেট থেকে একটা টপোগ্রাফি ও পেন্সিল টর্চ বের করল সে।

'কাল তোমাকে কী করতে হবে এখন তাই শোনো। সমস্ত তথ্য মনের মধ্যে ভাল করে গেঁথে নাও। তাতে তোমারই উপকার হবে।'

ম্যাপটা দু'জনের মাঝখানে বিছিয়ে টর্চ লাইটের সরু ফোকাস ফেলল সে তার ওপর। 'নাউ, শহীদুল্লাহ্, মন দাও এদিকে। কাল মাঝরাত থেকে শুরু হবে তোমাদের তিনদিনের সোলো প্র্যাকটিস। এবং কালই কাজটা করতে হবে তোমাকে।'

যেন মুখস্থ করে এসেছে, এমনভাবে বলে যেতে লাগল লোকটা। একটুও ইতস্তত ভাব নেই, একটা শব্দও বাধছে না, গড় গড় করে বলে চলেছে। 'ব্ল্যাক-সীর ওপর শুরু হবে তোমাদের একক চক্কর দু'একটা চক্কর দেবে তুমি, তারপর প্লেন নিয়ে এলাকা ছেড়ে সরে পড়বে। দক্ষিণে যাবে। তুরস্কের ওপর দিয়ে গিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেবে, তারপর মিশরের ওয়েসিস অভ সিওয়ায় যাবে। এখানে...' ম্যাপের গায়ে বাঁ তর্জনী দিয়ে খোঁচা মারল লোকটা।

'তেত্রিশ ডিগ্রী অক্ষাংশ আর চৌত্রিশ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশে পৌঁছে প্লেন তিনশো ফুটে নামিয়ে আনবে। উপকূলে পৌঁছার মোটামুটি একশো মাইল আগে দেখতে পাবে তুমি, টো করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটা প্লেনকে। ঠিক সময়ে ধ্বংস হয়ে যাবে ওটা। তোমার মিগের ধ্বংসাবশেষ বলে বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে সবাই ওটার ধ্বংসাবশেষকে।'

'তোমরা ভেবেছ এত সহজ ব্লাফে কাজ হবে?' বলল শহীদুল্লাহ্। 'অসম্ভব! আমি...'

পাত্তা না দিয়ে বলে চলল লোকটা। 'ওই প্লেন চোখে পড়ামাত্র নিজের স্পেয়ার ট্যাঙ্কগুলো ফেলে দেবে তুমি সাগরে, আর ওটায় বিস্ফোরণ ঘটার সাথে সাথে নিজের রেডিও অফ করে দেবে। এটা তুমি করবে নিজের নিরাপত্তার জন্যে। আর হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, তুরস্ক ছেড়ে এসেই মে-ডে পাঠাতে শুরু করবে তুমি। দ্বিতীয় প্লেনটা বিস্ফোরিত না হওয়া পর্যন্ত পাঠাতেই থাকবে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। 'তুমি এবং তোমার নিয়ন্ত্রক যারা রয়েছে, তারা প্রত্যেকে একেকটা বদ্ধ উন্মাদ। ভেবেছ এইভাবে কয়েক মিলিয়ন ডলার দামের একটা প্লেন তোমাদের হাতে তুলে দেব আমি, অথচ বাংলাদেশ কিছু টের পাবে না, তাই না? নিজেদের খুব সেয়ানা মনে করো তোমরা?'

মুখ তুলল লোকটা, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'ওরা ধরে নেবে মেডিটারেনিয়ানে ক্র্যাশ করেছ তুমি। তোমার মে-ডে আর ওই প্লেনের ধ্বংসাবশেষ মিলেমিশে দুইয়ে-দুইয়ে চার হবে। বাংলাদেশ তাকে চারই ধরে নেবে। ওয়েসিস অভ সিওয়ায় ল্যান্ডিঙের সুবিধের জন্যে আলো জ্বেলে রানওয়ে মার্ক করা থাকবে। ওখানে নেমে পড়বে তুমি।'

'আমার বোনকে কখন কোথায় ফেরত দিচ্ছ তোমরা?' অনেকক্ষণ পর প্রশ্ন করল শহীদুল্লাহ্।

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, সে-ঝাঁকিতে লাফিয়ে উঠল তার কালো দাড়ি। 'সে প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি। আগে বলো, তুমি সব বুঝতে পেরেছ তো? নাকি আবার বলতে হবে?'

'তার কোন দরকার নেই। যা বোঝার বুঝে নিয়েছি। তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'বেশ।' ম্যাপ ভাঁজ করে পকেটে ভরল লোকটা, টর্চলাইটটাও। 'সব যদি ভালয় ভালয় মিটে যায়, মরুভূমিতে মিগ ল্যান্ড করানোর পরপরই তোমাকে কপ্টারে মেডিটারেনিয়ানের

যেখানে প্লেন "ক্র্যাশ" করেছে, সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। পানি থেকে তোমাকে "উদ্ধার" করবে আমাদের এক জাহাজ। কপ্টার ও জাহাজ, দুটোই প্রস্তুত থাকবে।'

'তারপর?'

'জাহাজে করে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছে দেয়া হবে তোমাকে। সেখান থেকে মিশর সরকার তোমার দায়িত্ব নেবে। কায়রোয় পৌঁছে দেবে। ওখানে তোমার বোনকে ফেরত পাবে তুমি। ব্যস্, তারপর দু'জনে একসঙ্গে দেশে ফিরে যাবে।'

'হয়ে গেল?' মাথা ঝাঁকাল পাইলট। 'মিশর সরকার ঘটনা তদন্ত করে দেখবে না? ওদের তদন্ত কমিশনের সামনে জবাবদিহি করতে হবে না আমাকে?'

দাড়িতে হাত বোলাল লোকটা। 'নিশ্চই করতে হবে। কিন্তু ও নিয়ে চিন্তার কিছু নেই তোমার। ওই কমিশনের সদস্য যারা থাকবে, তারা আমাদের বন্ধু। হাত ধরে তোমাকে সাঁকো পার করিয়ে দেবে। পড়ে যাওয়ার ভয় নেই।'

চুপ করে থাকল শহীদুল্লাহ্। চোখ কুঁচকে বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল। অনেকক্ষণ পর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সচকিত হলো। 'বুঝলাম,' বলল সে। 'কিন্তু আমার বোন এই সময় মিশরে কেন, এই প্রশ্নের জবাব কী?'

'সোজা,' হাসির ভঙ্গি করল সে। 'ভাই অন্তপ্রাণ বোন, তোমার হারিয়ে যাওয়ার খবরে উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিল। ক'দিন পর যখন জানল তুমি মিশরে আছ, অমনি ছুটে এসেছে।'

'কোথেকে, ও তো নিখোঁজ!'

'নিখোঁজ ছিল। এখন আর নেই।'

'মানে? আমার ফুপু...'

'তোমার ফুপু প্রথমে না বুঝে একটু হই-চই করেছিল। পরে সে-সব ম্যানেজ করে ফেলেছি আমরা,' হাসল লোকটা। 'সন্দেহ

থাকলে বেজে ফিরে ঢাকায় ফোন করে দেখতে পারো তোমার ফুপু কী বলে।'

'কী...?' প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না পাইলট।

'সে বলবে, মৌ পরদিন সকালেই ফিরে এসেছে বাড়িতে। এখন ঘুমাচ্ছে, নয়তো বাথরুমে আছে বা আর কিছু। মোটকথা ও বাড়িতেই আছে, কিন্তু ফোনে পাবে না তুমি। এ ব্যাপারে খুব ভাল করে সমঝে দেয়া হয়েছে তোমার ফুপুকে। মোটকথা কোন কাজে খুঁত রাখিনি আমরা। কারও কিছু সন্দেহ করার পথ রাখিনি।'

মূর্তির মত বসে থাকল শহীদুল্লাহ্। কারা এরা? ভাবছে সে, এত আয়োজন কিসের জন্যে? মিগ টোয়েন্টিনাইন চুরি করে কী কাজে লাগাতে যাচ্ছে এরা?

দরজা খোলার শব্দে সচকিত হলো সে। দেখল এক পা বের করে দিয়েছে লোকটা। চোখাচোখি হতে বলল, 'আমাদের এই বৈঠকের ব্যাপারে যদি ভুলেও কারও সামনে মুখ খুলেছ, সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাব আমরা। কাজেই দয়া করে সামলে রেখো নিজেকে।'

একটু বিরতি দিয়ে বলল, 'যা যা বলেছি, সব মনে আছে তোমার?'

'আছে,' আরেকদিকে তাকিয়ে বলল শহীদুল্লাহ্

'গুড। কাল আরেকবার যোগাযোগ করা হবে তোমার সাথে। তোমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানার জন্যে। তোমার কাছে দেশপ্রেম বড় না ভগ্নিপ্রীতি, তাড়াতাড়ি সে ফয়সালা সেরে ফেলো। এর যে কোন একটাকে বিসর্জন দিতেই হচ্ছে তোমাকে। সী ইউ।'

দরজা লাগিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগল দাড়িওয়ালা। শহীদুল্লাহ্‌র ঝাপ্‌সা হয়ে আসা দৃষ্টির সামনে খুব দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল নীল টয়োটা সেডান।

পরদিন রাত দশটায় এলো শেষ ফোন। বাংলাদেশী পাইলটদের প্রি-ফ্লাইট ব্রিফিং শুরু হতে আধ ঘণ্টাখানেক বাকি তখন। কাটা কাটা, সংক্ষিপ্ত হলো ফোনালাপ।

'শহীদুল্লাহ্?' প্রশ্ন করল সেই দাড়িওয়ালা।

'হ্যাঁ।'

'আমাদের প্রস্তাবে রাজি আছ?'

'বাস্টার্ডস!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল ও।

'হোয়াট?'

'হ্যাঁ, রাজি।'

'ভাল। সে ক্ষেত্রে দু'দিনের মধ্যে বোনের দেখা পাওয়ার আশা করতে পারো তুমি।'

কুট্! শব্দে কেটে গেল লাইন।

রাত এগারোটা। ওড়ার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত চার বাংলাদেশী ফাইটার পাইলট–স্কোয়াড্রন লীডার সাব্বির, ফ্লাইং অফিসার নিয়াজ, এবং দুই ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, শহীদুল্লাহ্ ও রেজাউল। জি-ফোর্স নিরোধক আঁটসাঁট ড্রেস পরে বেসের কনফারেন্স রুমে এক সারিতে বসে আছে তারা। আড়ষ্ট। শুধু হেলমেটটা মাথায় দেয়া বাকি।

প্রি-ফ্লাইট ব্রিফিং চলছে। বেস কমান্ড্যান্ট মেজর ভ্লাদিমির ইলিচ শেভচেঙ্কো ব্রিফ করছে। সোলো রিকনাইসন্সের সময় কী করা জরুরী, কী নয়, এইসব সম্পর্কে একনাগাড়ে বলে চলেছে। না বললেও চলত, কেননা এ ব্যাপারে আগেই পাখি পড়ানো করা হয়েছে এদের চারজনকে। তবু নিয়ম বলে একটা কথা আছে।

পোলার ভালুকের মত প্রকাণ্ডদেহী শেভচেঙ্কো, চেহারা টকটকে লাল। বদমেজাজী বলে দুর্নাম আছে মানুষটার। দেশী-বিদেশী যে-ই আসুক, প্রথমদিকে তার সাথে সামান্যতেই

দুর্ব্যবহার করে। তবে সেটা সাময়িক, যে যত তাড়াতাড়ি শেখে তার প্রতি তত তাড়াতাড়িই সদয় হয় সে।

মাঝরাতের পনেরো মিনিট বাকি থাকতে ভাষণ থামল তার, বুক চিতিয়ে সারির কাছে এসে দাঁড়াল। একে একে হাত মেলাল চার অফিসারের সাথে, প্রত্যেককে 'বেস্ট অভ লাক' উইশ করল।

'নাউ লেট'স মুভ!'

রুম থেকে বেরিয়ে এলো দলটা, ধীর পায়ে টারমাকের দিকে এগোল। শহীদুল্লাহ্ রয়েছে সবার পিছনে, দুশ্চিন্তার ভারে মাথা তুলতে পারছে না। আর সবার মত আজ তারও বড় গর্বের দিন হওয়ার কথা ছিল, কারণ মিগ-২৯ নিয়ে একা উড়তে যাচ্ছে সে এতদিনে। কিন্তু গর্ব নয়, তার বদলে গ্লানি অনুভব করছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে নিজের দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে সে। ভঙ্গ করতে যাচ্ছে পবিত্র শপথ।

জীবনটা কী হতে পারত, অথচ কী হয়ে গেল, ভাবতে ভাবতে হেলমেট মাথায় দিল সে। নিজ মিগের কাছে অপেক্ষমাণ দেশী গ্রাউন্ড ক্রুদের নীরব অভিনন্দনের জবাবে মাথা নেড়ে খাটো অ্যালুমিনিয়ামের মই বেয়ে উঠে পড়ল কক্পিটে। নিজেকে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে প্রি-ফ্লাইট চেকিং সেরে নিয়ে স্টার্ট দিল। লক্ করে দিল ক্যানোপি।

ডানে তাকাল শহীদুল্লাহ্, ফ্লাইং অফিসার নিয়াজ হাত নাড়ল তার ককপিট থেকে। বাঁ দিক থেকে রেজাউলও নাড়ল। স্কোয়াড্রন লীডারকে দেখতে পেল না ও, তার প্লেন রয়েছে রেজাউলেরটার আড়ালে। সঙ্কেত পেয়ে সাব্বিরের মিগ গড়াতে শুরু করল, সে-ই লীডার। রেডিওতে কথা বলছে টাওয়ারের সাথে, প্রতিটা কথা শুনতে পাচ্ছে শহীদুল্লাহ্। সবই গৎ বাঁধা।

ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে চোখ বুলাল ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। সময় হয়ে গেছে, মাঝরাত হতে আর মাত্র চার মিনিট বাকি। মুখ

তুলতেই আলোর ঝলক চোখে পড়ল, দৌড় শুরু করে দিয়েছে লীডার। অপেক্ষমাণ তিন মিগের সামনে দিয়ে তীরবেগে ছুটে গেল ওটা, পিছনে টকটকে লাল আগুন ছড়াচ্ছে বিশাল দুই ইনটেক। দূর থেকে মনে হচ্ছে ও দুটো যেন তাড়া করছে মিগটাকে। দেখতে দেখতে শূন্যে ডানা মেলে দিল লীডার সাব্বির।

এরপর নিয়াজের পালা। তার দৌড় শুরু হতে নিজেরটার ব্রেক রিলিজ করল শহীদ। মনে হলো গড়িয়ে নয়, পিছলে এগোতে শুরু করল তার মিগ। স্টার্টিং মার্কে যাওয়ার পথে দ্রুত বেসের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল সে। অন্যরা ফিরলেও তার জন্যে এই শেষ দেখা, কারণ আর কোনদিন এখানে ফেরা হবে না শহীদুল্লাহ্‌র। যতটা সম্ভব ভাল করে দেখে নিল তাই।

শূন্যে উঠে অন্য দুটোর সাথে বেসের চারদিকের অনেকখানি জায়গা নিয়ে একটা চক্কর দিল সে, এরমধ্যে শেষ মিগটাও উঠে পড়ল। লীডারের পিছনে তীরের মাথার আকৃতিতে অবস্থান নিল অন্য তিনটা। শেষ সারির বাঁ দিকে থাকল শহীদুল্লাহ্‌। প্রচণ্ড গর্জনে কোবিয়াকোভার আকাশ কাঁপিয়ে দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগরের দিকে ছুটে চলল চার মিগ-২৯।

এক ঘণ্টা বিশ মিনিট পর নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে ফর্মেশন ভেঙে আলাদা হয়ে গেল ওরা, আগে থেকে ঠিক করে রাখা নিজ নিজ জোনে চক্কর শুরু করল। একটু পর পর সঙ্গীদের সাথে কথা বলছে লীডার সাব্বির। চমৎকার চলছে সব।

আরও খানিক পর হঠাৎ করে নীরব হয়ে গেল একটা মিগ-জি ৩২ এম, সাড়া দিচ্ছে না ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শহীদুল্লাহ্‌। প্রথমে খুব একটা পাত্তা না দিলেও মিনিট দুয়েক পর গুরুত্ব দিতেই হলো লীডারকে। একনাগাড়ে ডাকাডাকি করার পরও জবাব নেই ওটার।

ব্যাপারটা তক্ষুণি রিপোর্ট করল সে কোবিয়াকোভায় খবর শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল শেভচেঙ্কো, তারপর ঝড়ের গতিতে একের পর এক নির্দেশ দিতে শুরু করল। হন্যে হয়ে উঠল বাকি তিনটে মিগ-২৯, এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে এসে ওটাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল। ওগুলোর সাথে যোগ দিল আরও কিছু মিগ-২১ ও মিগ-২৫, কুরস্ক এয়ার বেস থেকে এসেছে ওগুলো। কোন লাভ হলো না।

এক সময় অবশ্য সাড়া পাওয়া গেল হারানো মিগের, অজ্ঞাত কোথাও থেকে ক্রমাগত মে-ডে জানাচ্ছে তখন শহীদুল্লাহ্।

তিন

বাইশ হাজার ফুট নিচে, পলকের জন্যে সরু, রুপোলী ফিতের মত ঝিলিক মেরে উঠল বুড়িগঙ্গা। তারপরই নেই হয়ে গেল। পরের কয়েক সেকেন্ড মেঘের রাজ্যে আটকা পড়ে থাকল মিগ-২৯, ধরণীর পাত্তা নেই। আড়াল ছেড়ে বের হতেই আবার ঝিলিক—মেঘনা।

ককপিট থেকে মেঘনার সাইজ দেখে মুচকে হাসল পাইলট মাসুদ রানা। মনে হচ্ছে চওড়া একটা ড্রেন বুঝি ওটা, লম্বা পা ফেলে হেঁটেই পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব। সামনে নজর দিল ও, বিদ্যুৎগতিতে যান্ত্রিক পাখিটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল বঙ্গোপসাগরের দিকে। মিগ-২৯ চালনার ট্রেনিং চলছে ওর। সাত

দিনের শর্ট-কোর্স, আজই শেষ দিন।

রাশিয়ার তৈরি মিগ আগেও অনেকবার চালিয়েছে ও, কিন্তু সেগুলো ছিল ২১, ২৫ বা ২৭ । ২৯ এই প্রথম। এই মডেলের ফাইটার প্লেন আগের দুটো মডেলের তুলনায় অনেক আধুনিক, অনেক সফিস্টিকেটেড, তাই মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের যাকে বলে আচমকা নির্দেশে এ কাজ করতে হচ্ছে। বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লীডার সাব্বিরের তত্ত্বাবধানে এই বিশেষ ট্রেনিঙে সাতদিনেই সাফল্যের সঙ্গে উত্রে গেছে রানা।

এ মুহূর্তে পিছনের নেভিগেটর গানার'স সীটে বসে আছে সাব্বির, সতর্ক নজর রেখেছে শিষ্যের কার্যকলাপের ওপর। মাসুদ রানার আসল পরিচয় তার জানা নেই, তবে ও যে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কেউ হবে, সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধি তার মাথায় আছে। তার ধারণা, এই ট্রেনিং কোর্সের সাথে দু'সপ্তাহ আগে কোবিয়াকোভা থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মিগের ঘনিষ্ঠ কোন সম্পর্ক আছে।

সেটা যা-ই হোক, মনে মনে রানার সাফল্য কামনা করছে সে গত তিনদিন থেকে।

সন্ধের কিছুক্ষণ আগে শেষ হলো ট্রেনিং। কুর্মিটোলা এয়ারফোর্স বেস ত্যাগ করার আগে সাব্বিরের সাথে হাত মেলাল ও। 'থ্যাঙ্কস ফর এভরিথিং।'

'হোয়াটএভার ইজ ইওর মিশন, সার,' স্কোয়াড্রন লীডার বলল। 'আপনার সাফল্য কামনা করছি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। উঠে পড়ল গাড়িতে। কেন হঠাৎ এই ট্রেনিঙের আয়োজন করলেন রাহাত খান? ভাবতে ভাবতে মতিঝিলের দিকে ছুটল ও। এরপর কী?

'আত্মহত্যা করেছে?' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন রাহাত খান। 'আদরের বোনটাকে পেল না, কয়েক মিলিয়ন ডলারের প্লেনটাও হাতছাড়া হয়ে গেল, এত মানসিক চাপ সহ্য করতে পারেনি ছেলেটা। তাই আত্মহত্যা করে মনের ক্ষোভ মিটিয়েছে।'

বিসিআই। বৃদ্ধের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা। বাইরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তাঁর পিছনের জানালার সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা পর্দার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমাকাশে রাঙা মেঘ দেখতে পাচ্ছে ও।

'তার আগে আমাদের কায়রো রাষ্ট্রদূতের নামে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে সে,' বললেন রাহাত খান। অন্যমনস্ক। ডানদিকের টপ ড্রয়ার থেকে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিলেন ওর দিকে। ওটার একদিকের মুখ ছুরি দিয়ে কাটা।

'এই যে সেটা। পড়ে দেখো।'

ওটা নিল রানা, কিন্তু তখনই খুলল না। খাম নাড়াচাড়া করছে। নজর অস্তগামী সূর্যের আলোয় রাঙা আকাশে। সূর্যাস্ত আর মৃত্যু, দুটোর মধ্যে একটা মিল আছে, ভাবছে ও, দুটোই সমাপ্তি ঘোষণা করে। সূর্যাস্ত সবসময়ই বিষণ্ন করে তোলে রানাকে, আজ তার সাথে যোগ হয়েছে দু'দুটো অসময়োচিত মৃত্যুর খবর। তাই দ্বিগুণ বিষণ্ন ও।

এখন কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারছে কেন ওকে হঠাৎ মিগ-২৯ চালনার ট্রেনিং নিতে পাঠিয়েছিলেন বৃদ্ধ। তাঁর প্রচুর বিরক্তি উৎপাদন করে যথেষ্ট সময় নিয়ে চিঠিটা বের করল রানা। কায়রোর এক হোটেলের লেটারহেড প্যাডে লেখা ওটা। হাতের লেখা আঁকাবাঁকা, পুরো চিঠি কাটাকুটিতে ভরা। দেখলেই বোঝা যায় লেখার সময় পাইলটের মনের অবস্থা কেমন ছিল।

পড়তে শুরু করল রানা। নিজের পরিচয় জানিয়ে এলোমেলো ভাষায় তার পারিবারিক অবস্থা, ছোট বোনের অপহরণ, অজ্ঞাত গোষ্ঠিটির দাবি এবং তার মিগ নিয়ে ওয়েসিস অভ সিওয়ায়

পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছে ওতে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শহীদুল্লাহ্।

শেষে লিখেছে: ওরা বলেছিল প্লেনটা পেলে আমার বোনকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু কথা রাখেনি ওরা। মৌকে ফেরত দেয়নি। বলেছে, সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে আমার বোন। তার মৃতদেহের ছবি অবশ্য দেখিয়েছে আমাকে।

যাকে আপন সন্তানের মত স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বড় করেছি, দেশ ছেড়ে আসার আগের রাতেও যাকে গল্প বলে ঘুম পাড়িয়েছি, যার জন্যে জননী জন্মভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও বাধেনি আমার, তার এই পরিণতি মেনে নিতে পারছি না। বেঁচে থাকার সমস্ত অবলম্বন হারিয়ে গেছে আমার, কোন সান্ত্বনাই আর নেই। তাই নিজের জীবনের সমাপ্তি টানতে যাচ্ছি আমি। কিন্তু তার আগে একটা তথ্য আপনার মাধ্যমে দেশকে জানিয়ে যাওয়া জরুরী মনে করছি।

তা হলো, প্লেনটাকে এ দেশের সিওয়া মরুভূমিতে ল্যান্ড করিয়েছিলাম আমি –ডিগ্রী অক্ষাংশ ও –ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশে। তবে এখন সেখানে নেই ওটা, আমার উপস্থিতিতেই বড় এক ফ্ল্যাট ক্যারিয়ারে তুলে আর কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর সাথে যারা জড়িত, আমার বিশ্বাস তারা বাংলাদেশের একটি ধর্মান্ধ গোষ্ঠির সদস্য। ওই প্লেন নিয়ে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটাতে যাচ্ছে তারা। দয়া করে ওদের ঠেকানোর ব্যবস্থা করুন। তাড়াতাড়ি। নইলে হয়তো দেরি হয়ে যাবে, দেশের ক্ষতি হয়ে যাবে অনেক।

চিঠিটা যত্নের সাথে ভাঁজ করে খামে পুরল রানা, ফিরিয়ে দিল বৃদ্ধকে। চেহারা ভীষণ রকম শান্ত।

'ছেলেটা ঠিকই বলেছে,' বললেন রাহাত খান। 'ওর বোনকে যে অপহরণ করেছে, তার নাম মুফতি তমিজউদ্দিন, বাংলাদেশ হরকতুল মুজাহেদীন আন্দোলন নামে এক গোঁড়া ধর্মান্ধ গোষ্ঠির

সদস্য সে। নেতা গোছের। লালবাগের স্থানীয় লোক। খুবই ধনী পরিবারের ছেলে। উচ্চশিক্ষিত।'

'মুফতি তমিজউদ্দিন?' রানা বলল। 'ফয়েজ আহমেদ না?'

'ওদের ফুপুকে তাই বলেছিল লোকটা। কিন্তু আমরা তার দেয়া বর্ণনা আর মৌয়ের যে দুই বান্ধবী সেদিন ওর সাথে ছিল, তাদের বর্ণনা অনুযায়ী খোঁজ নিয়ে জেনেছি সে আসলে তমিজউদ্দিনই। লোকটার ছবি দেখানো হয়েছে ওদেরকে, সবাই আইডেন্টিফাই করেছে।'

সময় নিয়ে পাইপ ধরালেন বৃদ্ধ, নীরবে টানলেন কিছুক্ষণ। 'মেয়েটার সাথে যে দুই বান্ধবী ছিল, ওরা সেদিন বাড়ি ফিরে মৌয়ের ফুপুকে ফোন করে অচেনা এক লোকের সাথে ওর চলে যাওয়ার কথা জানায়। তখনই খবরটা ডিজিএফআইকে জানান মহিলা, তারা খবর দেয় ক্যান্টনমেন্ট থানাকে।

'দু'পক্ষই মেয়েটাকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছে, সেই রাতেই কয়েক জায়গায় হানা দিয়েছে তারা, কাজ হয়নি। এর দু'দিন পর, হঠাৎ মহিলা ডিজিএফআইকে জানালেন, তার ভাইঝি ফিরে এসেছে। কিন্তু...তারপরও মৌ চারদিন স্কুলে না যাওয়ায় বান্ধবীরা ওর খোঁজ নিতে বাসায় যায়। গিয়ে পায়নি মেয়েটিকে। ওদের প্রশ্নের জবাবে মহিলা একেকবার একেক কথা বলতে থাকলে মেয়েদের সন্দেহ হয়।

'মহিলাকে চেপে ধরে ওরা। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীকার করেন মৌ আসলে ফিরে আসেনি। অজ্ঞাত কেউ টেলিফোনে হুমকি দেয়ায় মিথ্যে বলেছিলেন তিনি। না হলে মৌকে মেরে ফেলা হবে বলে ভয় দেখিয়েছে কলার। এসব কথা কাউকে না বলার জন্যেও ওদেরকে বারবার অনুরোধ করেন ভদ্রমহিলা। এরপর আবার ডিজিএফআইয়ের কানে যায় খবরটা। ওরা গোপনে খোঁজ নিয়ে দেখল ঘটনা সত্যি। তখন আমাদের সাহায্য চাইল ওরা।

'তদন্তে জানা গেছে লোকটার আসল পরিচয়। আমাদের রেকর্ডে লোকটার ছবি আছে।'

'এখন কোথায় লোকটা?' রানা প্রশ্ন করল।

'দেশেই,' একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন বৃদ্ধ। 'কড়া নজর রাখা হয়েছে ওর ওপর।'

'মৌকে তাহলে মিশরে নিয়ে গেল কে?'

মাথা নাড়লেন তিনি। 'জানা যায়নি। আমরা কেসটা টেক আপ করার আগেই সরিয়ে ফেলা হয় ওকে।'

'আপনি বললেন, আমাদের ফাইলে মুফতি তমিজউদ্দিনের ছবি আছে,' বলল ও। 'কেন, সার? আগে থেকেই আমাদের সন্দেহের তালিকায় ছিল লোকটা?'

'না। ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয়। খুব ঘন ঘন বিদেশ যাওয়া-আসা করে লোকটা। এ ধরনের সবার ছবিই তুলে থাকে আমাদের এয়ারপোর্ট এজেন্টরা। এর ব্যাপারেও তাই হয়েছে। তবে...' থেমে গেলেন রাহাত খান। ভুরু কোঁচকালেন।

'জ্বি, সার?' কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল ও।

'মৌয়ের নিখোঁজ হওয়ার সাথে তমিজউদ্দিনের হাত আছে জানার পর গত দু'দিন তার ব্যাপারে ভাল করে খোঁজ-খবর নিয়েছি আমি। প্রথমে ধারণা ছিল বড়লোক ব্যবসায়ীর ছেলে, নিশ্চয়ই ব্যবসার কাজে বিদেশ যায়, কিন্তু এখন সন্দেহ হচ্ছে তা সত্যি নয়। অন্য কোন কাজে যায়। অন্তত তাদের পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ও অন্যান্য ডকুমেন্ট দেখে তাই মনে হয়। দু'বছর আগে যে পরিমাণ ট্যাক্স দিত, আজও তাই দিচ্ছে ওরা। ধরা বাঁধা অঙ্ক।'

'অবৈধ কোন ব্যবসা থাকতে পারে,' রানা বলল।

'পারে,' মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে। গত তিন মাসে চারবার রাশিয়ায় গেছে তমিজউদ্দিন। নতুন মিগ

ডেলিভারি নিতে আমাদের পাইলটরা যে সময় কোবিয়াকোভা গিয়েছিল, তার ক'দিন পর প্রথমবার মস্কো যায় সে। শেষবার গেছে মৌ নিখোঁজ হওয়ার দেড় সপ্তা আগে। আর দেশে ফেরার পথে প্রত্যেকবারই ফিরেছে মিশর হয়ে।'

চুপ করে থাকল রানা। ভাবছে, গত ত্রিশ বছরে অনেকেই অনেকভাবে ষড়যন্ত্র করেছে দেশের বিরুদ্ধে, এ আবার আরেক রকম! কী মতলব ওদের? এত সাহস পেল কোত্থেকে? শুধু তাই নয়, একটা মিগ এভাবে দখল করা, তার সাহায্যে কিছু ঘটাতে যাওয়া ইত্যাদির পেছনে যে ব্যাপক সাংগঠনিক শক্তি প্রয়োজন, যে বিশাল অঙ্কের টাকার প্রয়োজন, সে-সব কোত্থেকে পাচ্ছে এইসব দেশী মৌলবাদীরা?

কোথায় কী ঘটাতে চলেছে স্বাধীনতা বিরোধী এই ধর্মান্ধ লোকগুলো? অস্বস্তির সাথে ভাবল ও। মিশরে কেন ঘাঁটি গেড়েছে? সে দেশের কে বা কোন্ গোষ্ঠি সাহায্য করছে ওদের?

'এ ব্যাপারে ইজিপশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস চীফ, মাহমুদ বে-র সাথে যোগাযোগ করেছি আমি,' বললেন রাহাত খান। 'তথ্য চেয়েছি। জবাবে যতদূর জানা গেছে, তাতে এটা পরিষ্কার যে ও দেশের অতি-ইসলামিক মৌলবাদী গোষ্ঠির সাথে দহরম-মহরম আছে তমিজউদ্দিনের। কিন্তু সরাসরি এর কোন প্রমাণ নেই। আর প্রমাণ ছাড়া ওরা কোন পদক্ষেপ নিতে পারবে না, কারণ ওদের দেশের ধর্মান্ধ গোষ্ঠিগুলো আরও বিপজ্জনক। অল্পেতেই গরম করে তোলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি,' থামলেন তিনি।

নিভে যাওয়া পাইপের তামাক ফেলে নতুন করে ধরালেন। নীরবে টানলেন কিছুক্ষণ। ভুরু কুঁচকে আছে চিন্তায় অন্যমনস্ক। 'মিগ নিয়ে যে ওদের বিশেষ কোন পরিকল্পনা আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা যে কী হতে পারে, কিছুতেই মাথায় আসছে না। তবে ওদের পদক্ষেপ দেখার অপেক্ষায় বসে থাকলে

চলবে না আমাদের। কিছু করে বসার আগেই ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'আমাকে কী করতে হবে, সার?' প্রশ্ন করল ও।

'গ্রীস যাচ্ছে তমিজউদ্দিন, তিনদিন পর। তুমিও যাচ্ছ তার সঙ্গে।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধ। 'ঠিক সঙ্গে নয় অবশ্য, ওকে অনুসরণ করে।'

'বুঝেছি।'

'মিশরীয় এক গায়িকা এ মুহূর্তে এথেন্সে আছে। মাহমুদ বে-র খবর অনুযায়ী তার সাথে তমিজউদ্দিনকে কয়েকবারই কায়রোয় দেখা গেছে। অথচ তমিজউদ্দিন যে ধর্মান্ধ গোষ্ঠির অনুসারী, হরকতুল মুজাহেদীন, তার সাথে গান বাজনার ব্যবধান হাজার মাইলের। রহস্যজনক ব্যাপার। খুব সম্ভব এথেন্সেও যোগাযোগ হবে দু'জনের। খুব সম্ভব না, আমার বিশ্বাস হবেই।'

'কোন্ গায়িকা, সার? নামটা—?'

'তাবাস্সুম,' বৃদ্ধ বললেন।

'তাবাস্সুম!' বিস্মিত হলো রানা। 'সে তো নাম করা আরবী পপ্ শিল্পী!'

'হ্যাঁ। মিডল ইস্টে খুবই নামকরা। মাহমুদ বে-র সন্দেহের তালিকায় সে-ও আছে।'

'আচ্ছা!'

মৃদু মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'মেয়েটা প্রায়ই দলবল নিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায় জাহাজে করে। উচ্চতা ভীতি আছে বলে কখনও প্লেনে চড়ে না। মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের মতে সে যা আয় করে, তারচেয়ে হাজার গুণ বেশি করে ব্যয়। এই বাড়তি টাকা কোত্থেকে আসে কেউ জানে না। ওদের ধারণা, মাদক ব্যবসায়ে জড়িত আছে তাবাস্সুম। ধারেকাছের যে-সব জায়গায় মাদক বেশি-বেশি চলে, ক'দিন পর-পরই সেই সব জায়গায় গিয়ে হাজির হয় সে। যেমন গ্রীস, রোডস আইল্যান্ড,

মালেকজান্দ্রিয়া…এইসব আর কি।

'তমিজউদ্দিন হয়তো তার সাথে এই কাজেও জড়িত, কে জানে! আজ থেকে সাতদিন পর এথেন্স-আলেকজান্দ্রিয়াগামী জাহাজে চড়তে যাচ্ছে তাবাস্সুম। ধরে নেয়া যায়, তার সাথে তমিজউদ্দিন থাকবে। তাই তোমার জন্যেও ওই জাহাজের একটা টিকেট বুক করা হয়েছে।'

'জ্বি, সার।'

গম্ভীর হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। গমগমে কণ্ঠে বললেন, 'যেমন করে হোক প্লেনটা খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে, রানা। দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে ওটা। বুঝতে পেরেছ?'

তাঁর বলার ভঙ্গি দেখে মনে মনে হাসল রানা। মনে হচ্ছে যেন পাঠশালার পণ্ডিত অ আ ক খ শেখাচ্ছে ওকে। 'জ্বি, সার।'

'আর যদি ফিরিয়ে আনা একান্তই সম্ভব না হয়, ওটাকে ধ্বংস করে রেখে আসবে।'

'যদি মরে না যাই, তাহলে ফিরিয়েই আনব, সার,' দৃঢ় স্বরে বলল রানা।

'আমিও তাই আশা করি,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন বৃদ্ধ। 'নইলে এত বড় ক্ষতির ধকল সামলাতে বহুদিন লেগে যাবে আমাদের।'

'জ্বি।'

'কোনও প্রশ্ন?'

'না, সার।' উঠবে কি না ভাবছে রানা।

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'গুড লাক, রানা।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, সার।' উঠে পড়ল ও।

চার

'আপনার এ দেশে আসার কারণ, মিস্টার ব্রুনো ডিয়েট্রিচ?' পাসপোর্ট থেকে চোখ তুলে রানাকে দেখল এথেন্স এয়ারপোর্টের মাঝবয়সী, প্রকাণ্ড ভুঁড়িওয়ালা কাস্টমস অফিসার। মুখটাও প্রকাণ্ড তার, তেলতেলে।

'প্রধানত ব্যবসা,' বলল ও। 'তারপর সময় পেলে দেশটা ঘুরেফিরে দেখার ইচ্ছে আছে। বিশেষ করে মাউন্ট অলিম্পাস।'

'কিসের ব্যবসা আপনার, সার?'

'এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট। মেশিনারীজ।'

'কতদিন থাকবেন?'

'কমপক্ষে এক সপ্তা।'

ওর একমাত্র লাগেজ ব্রীফকেসটার দিকে তাকাল অফিসার। 'ডিক্লেয়ার করার মত কিছু আছে সঙ্গে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'নেইন।'

ও কেসের ডালা তুলে ধরতে ভেতরে এক পলক নজর বোলাল লোকটা, মাথা ঝাঁকাল। দুম্ করে সীল মেরে পাসপোর্ট ফেরত দিল। 'উইশ ইউ হ্যাপি স্টে, সার।'

'ভ্যাঙ্কি।'

এয়ারকন্ডিশন্ড টার্মিনাল ভবন থেকে বের হয়ে এলো হের ব্রুনো ডিয়েট্রিচ, ওরফে মাসুদ রানা। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড গরমে গায়ে

জ্বালা ধরে গেল। চিঁড়বিড় করতে লাগল সারা শরীর। স্থানীয় সময় দুপুর সোয়া দুটো। অসহ্য গরমে হাঁসফাঁস করছে এথেন্স, চোখ ঝলসে দেয়া কড়া রোদ। ভিড় ঠেলে ছায়ায় ছায়ায় এগোল ও, কিন্তু বেশি দূর যেতে হলো না। দশ-বারো কদম যেতে না যেতেই একটা আধা ঝক্কর মার্কা গাড়ি বেরিয়ে এলো ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে। সশব্দে ব্রেক কষল ওর সামনে। হাত বাড়িয়ে পিছনের দরজা খুলে দিল বয়স্ক ড্রাইভার।

স্বস্তি পাওয়ার আশায় তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা, পরক্ষণে বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল। সীট তো নয়, যেন ভুল করে গরম তাওয়ার ওপর বসে পড়েছে। ঘুরে তাকাল ড্রাইভার। তার খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফের এক জায়গায় একটা ফাটল দেখা দিল, সেখানে একসারি দাঁত দেখা যাচ্ছে। 'হোয়্যার টু, সার?' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জানতে চাইল লোকটা।

'কিংস প্যালেস!' তিরিক্ষি ভঙ্গিতে বলল ও।

চোখের পলকে হাসি মুছে গেল লোকটার মুখ থেকে, তার বদলে সমীহ ফুটল দৃষ্টিতে। কিংস প্যালেস যেমন-তেমন লোকের জন্য নয়, ভাল পয়সাওয়ালাদের জায়গা। ওখানকার যাত্রী জোটা ভাগ্যের ব্যাপার। ঘাড় সোজা করে ঝট্‌পট্‌ গিয়ার দিল সে। 'রাইট, সার।'

পরক্ষণে লাফ দিল ট্যাক্সি, খুব দ্রুত উঠে এলো বড় রাস্তায়, হাঁ-হাঁ করে ছুটল। যতটা লাগার কথা, তার অর্ধেক সময়ে জায়গামত পৌঁছে আরেকবার দাঁত দেখাল লোকটা। ভাড়ার সাথে মোটা টিপস্‌ দিয়ে নেমে পড়ল রানা, পাকস্থলীতে অদ্ভুত এক অনুভূতি নিয়ে পা বাড়াল হোটেলটার কাঁচের তৈরি বিশাল মেইন এন্ট্রান্সের দিকে।

নাম যেমন, দেখতেও তেমন। ষোলোতলা বিশাল ভবন। ।।শে বড়সড় ফুলের বাগান আছে, আর আছে সারি সারি পাম

গাছ–দুপুরের তপ্ত, অলস বাতাসে সর-সর শব্দে দুলছে ওদের লম্বা, চিরল পাতাগুলো। সময়মত গেটম্যান কাঁচের দরজা মেলে ধরল, ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। মোমপালিশ করা ঝকঝকে ফ্লোরের প্রশস্ত ফয়েই অতিক্রম করে রিসেপশন ডেস্কের দিকে চলল দৃঢ় পায়ে।

ওকে দেখে স্বাভাবিক মাপের চেয়ে একটু বেশি চওড়া হাসি ফুটল অল্পবয়সী সুন্দরী রিসেপশনিস্টের মুখে। 'হাউ ক্যান আই হেলপ্ ইউ, সার?'

'আমার নামে স্যুইট বুক করা আছে,' পাল্টা হাসল ও। 'ব্রুনো ডিয়েট্রিচ, ফ্রম লন্ডন।'

রেজিস্টারে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল মেয়েটা। 'রাইট, সার,' বলে ওটা ঘুরিয়ে দিল ওর দিকে। 'এখানে একটা সই করুন, প্লীজ। স্যুইট ফাইভ-ও-ফোর। ফিফথ্ ফ্লোর।'

সই করে পাসপোর্ট জমা দিল ও। পিছনের কী বোর্ডের দিকে হাত বাড়াল মেয়েটা। এদের প্রতিটা ফ্লোরে চারটে করে স্যুইট, জানা আছে রানার। ফিফথ্ ফ্লোরের শেষ স্যুইটটা এইমাত্র ও দখল করল, বাকি তিনটে আগে থেকেই বেদখল হয়ে আছে। এক নম্বরে আছে সায়মা; দুই নম্বরে তাবাস্সুম। তিন নম্বর এখনও খালি, তবে মুফতি তমিজউদ্দিনের নামে বুক করা আছে। আরও চব্বিশ ঘণ্টা ওভাবেই থাকবে ওটা। কেননা তমিজউদ্দিন এখনও পথে।

দৌড় প্রতিযোগিতায় লোকটাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে রানা। এজন্যে অবশ্য বিসিআইকে খানিকটা কলকাঠি নাড়তে হয়েছে। ওপরওয়ালার নির্দেশে বাংলাদেশ বিমান লোকটার লন্ডন-এথেন্স কনফার্মড টিকেট 'অনিবার্য কারণ' দেখিয়ে পরবর্তী ফ্লাইটে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে শেষ মুহূর্তে। এথেন্সে 'গুছিয়ে নেয়া'র জন্যে এই সময়টুকু দরকার ছিল রানার।

এই 'এগিয়ে থাকা'কেও এসপিওনাজ জগতে 'অনুসরণ' বলে। টার্গেটের পিছু লেগে থাকলে অনেক সময় 'অনুসরণকারী'র ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা কম। 'টার্গেটে'র গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলে এরকম 'এগিয়ে থাকা'য় মাঝে মাঝে খুব ভাল কাজ হয়। তাই একেবারে শেষ মুহূর্তে কলকাঠি নেড়েছেন রাহাত খান।

ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রানা চাবি নিয়ে, হাসির শব্দটা কানে এলো। নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ, উঁচুপর্দার হাসি। সাথে আরও দুয়েকটা গলাও আছে, কিন্তু প্রথমটাই চ্যাম্পিয়ন। অন্যগুলোর তুলনায় ওটা অন্তত বিশ ডেসিবেল চড়া। দুই যুবতী ও দুই যুবকের ওপর চোখ পড়ল ওর, ফয়েই-এ ঢুকছে দলটা। যুবকদের সহজেই আফ্রিকান বলে চেনা যায়। ষণ্ডামার্কা স্বাস্থ্য তাদের, তেমনি চেহারা-সুরত। দু'জনের হাতেই কয়েকটা করে ব্যাগ-প্যাকেট ইত্যাদি।

চ্যাম্পিয়ন যুবতীকে একনজর দেখেই চিনল রানা—পপশিল্পী তাবাস্সুম। অন্যজন তার বান্ধবী-কাম-সেক্রেটারি সায়মা। এদের চেহারা বা গায়ের রঙে জাতীয়তার কোন ছাপ নেই। প্রথমজন প্রায় ইওরোপীয়ানদের মতই ফরসা। রানার মনে হলো কোন আরব্য রূপকথার রাজকুমারী বুঝি, অভাব কেবল উপযুক্ত রাজকীয় সাজ-পোশাকের।

রয়্যাল ব্লু রঙের লো-কাট্ টাইট ফিট গাউন পরে আছে যুবতী, পায়ে হাইহিল। বাঁ হাতের কনুইয়ের ভাঁজে ঝুলছে গুই সাপের চামড়ার বড়সড় এক হাতব্যাগ। কানে-গলায় ভারী অলঙ্কারের বোঝা। পাঁচ ফুট তিন কী চার হবে মেয়েটি, বাজ পাখির ঠোঁটের মত বাঁকা নাক। চোখের রং হালকা নীল। ভরাট দেহ। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ।

সায়মা তার চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা। গায়ের রং সামান্য চাপা। বয়স একই হবে। যুবক দু'জনের ভাবভঙ্গি দেখে

তাদেরকে বডিগার্ড মনে হলো রানার। ওর প্রায় গা ঘেঁষে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল সায়মা। দামী পারফিউমের ঝাপ্‌টা লাগল নাকে।

'চাবি, প্লীজ!' বলল্ সে।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটা দুটো চাবি তুলে দিল তার হাতে। বিনয়ের সাথে তাবাস্‌সুমের উদ্দেশে বলল, 'একটা মেসেজ আছে আপনার জন্যে, মিস্!' একটা মুখ বন্ধ খাম এগিয়ে দিল।

ভুরু কুঁচকে নিল ওটা গায়িকা, ওখানে দাঁড়িয়েই খুলল। এক মুহূর্ত পর বিরক্তিসূচক শব্দ করে আরবীতে বলল, 'যাহ্!' সায়মার দিকে তাকাল। 'শুধু শুধুই তাড়াহুড়ো করলাম। আজ আসছে না ও।'

'কেন?' বিস্মিত হলো সায়মা।

'ফ্লাইট শেডিউলে কী ঘাপ্‌লা!' বিরক্তির সাথে বলল গায়িকা। 'লন্ডনে এসে আটকে গেছে। কাল আসবে।'

'ও...তা...'

'রিসিভ করতে যাব বলে তাড়াতাড়ি ফিরলাম!' বিড়বিড় করে বলল তাবাস্‌সুম। 'আরও কিছু কেনাকাটা বাকি ছিল। এখন...?'

'যাক্‌গে,' সায়মা বলল। 'বিকেলে না হয় আরেকবার যাব।'

দুই বান্ধবী নিচু গলায় কথা বলতে বলতে লিফটের দিকে এগোল। রানা এতক্ষণ ব্রীফকেস খুলে ভেতরে কিছু 'খুঁজছিল', কাজ 'শেষ হতে' শ্রাগ করল। দলটার পিছন পিছন চলল। ওদের সাথে একই লিফটে উঠতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাধা দেয়া হলো। ষণ্ডাদের একজন পথ আগলে দাঁড়াল। 'কোন ফ্লোরে যাবেন?' ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে জানতে চাইল সে।

ব্যাটার অভদ্র আচরণ দেখে মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল ওর। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকাল। 'ফিফ্‌থ্। কেন?'

'এটায় জায়গা নেই। অন্য একটায় যান, প্লীজ।'

'পড়তে জানেন?' শান্ত গলায় বলল রানা।

'কী?'

'ওখানে কী লেখা আছে?' হাত তুলে লিফটের ভেতরের বাটনবোর্ড দেখাল ও। লোকটার আড়ালে দুই বান্ধবী এখনও আলোচনায় ব্যস্ত, এদিকে খেয়াল নেই কারও।

ওদিকে ঘুরে তাকাল আফ্রিকান। দেখল ওখানে লেখা: টেন পার্সনস। সঙ্গীর সমস্যা দেখে দ্বিতীয় ষণ্ডা এগিয়ে এলো। 'এই যে, মিস্টার! এত কথার কী দরকার! লিফটের তো অভাব নেই,' বলে দরজা বন্ধ করার বাটন টিপে দিল। 'আরেকটায় আসুন।'

দরজাটা বন্ধ হতে হতেও হলো না অজ্ঞাত কারণে, খুলে গেল। ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল লোকটা। দেখল দরজার ফাঁকে ডান পা ভরে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘাড়ত্যাড়া যুবক। ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট পুরো না হওয়ায় বন্ধ হয়নি ওটা। খুলে গেছে। লোকটার সাথে চোখাচোখি হতে মাথা ঝাঁকাল ও। চেহারা নির্বিকার। 'তোমরা চাইলে যেতে পারো, আমার আপত্তি নেই। পথ ছাড়ো!'

এতক্ষণে ব্যাপারটা খেয়াল করল মেয়েরা। তাবাস্সুমের ফরসা মুখের একাংশ দেখতে পেল রানা। উঁকি দিয়ে ওকে দেখতে পেয়েই ভুরু কোঁচকাল সে।

'আজিজ! কী হয়েছে?'

রানা দিল জবাবটা। 'এরা আমাকে উঠতে দিচ্ছে না জায়গা নেই বলে।'

'কেন?' রেগে উঠল গায়িকা। 'এ কী অভদ্রতা! সরে দাঁড়াও, উঠতে দাও ভদ্রলোককে!'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সরে গেল ষণ্ডা, উঠে পড়ল রানা। মাথা ঝাঁকাল গায়িকার উদ্দেশে। 'ধন্যবাদ।'

নীরব, মিষ্টি হাসির সাথে ওকে দেখল শিল্পী। ঘাড় পর্যন্ত দীর্ঘ, কুচকুচে কালো চুল দুলিয়ে বলল, 'ও বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না।'

'ঠিক আছে,' ঠোঁট টিপে ওর ভুবন ভোলানো হাসি হাসল রানা। 'করব না।'

শব্দ করে হাসল গায়িকা। দুই ষণ্ডার উদ্দেশে ভুরু কুঁচকে কী যেন বলল, খেয়াল করেনি রানা, ওর খেয়াল দ্বিতীয় মেয়েটির ওপর। সে-ও মিটিমিটি হাসছে রানার রসাল মন্তব্যে। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বোলাচ্ছে। প্রথমজনের চেহারায় একটু রুক্ষতা আছে, খেয়াল করে দেখল রানা। সংযমের অভাব আছে তার। কিন্তু সায়মা উল্টো। মিষ্টি, কমনীয় চেহারা। ভারি স্নিগ্ধ। পাঁচ ফুট ছয়ের মত দৈর্ঘ্য তার, হালকা-পাতলা গড়ন।

ক্রীম রঙের গাউন পরে আছে মেয়েটা, কোমরে চওড়া বেল্ট। মাঝ পিঠ পর্যন্ত দীর্ঘ, ঘন কালো চুল। চিকচিক করছে। কানে সাধারণ রিং পরেছে, গলায় কিছু নেই। ডান হাতে হিরে বসানো সোনার ব্রেসলেট। এতেই দারুণ লাগছে মেয়েটাকে।

'কোন ফ্লোরে যাবেন আপনি?' লিফট রওনা হতে জানতে চাইল গায়িকা।

'ফিফথ্,' রানা বলল ব্রীফকেসটা দু'পায়ের মাঝে রেখে।

'ফিফথ্?'

'হ্যাঁ স্যুইট নাম্বার ফোরে উঠেছি আমি।'

'তাই নাকি?' হাসল তাবাস্সুম। 'আপনি তাহলে আমাদের প্রতিবেশী!' রানাকে এক ভুরু উঁচু করতে দেখে যোগ করল, 'এক আর দুই নাম্বারে আছি আমরা দুই বান্ধবী, ইঙ্গিতে সায়মাকে দেখাল

'বাহ্!' হাসল ও। 'একেই বলে ডবল সৌভাগ্য

'কী রকম?' সায়মা প্রশ্ন করল এবার।

'একে আপনার বান্ধবী এতবড় একজন শিল্পী,' বলল রানা। 'তার ওপর এরকম সুন্দরী। সেই সাথে আপনি আরেক অসামান্যা সুন্দরী। সৌভাগ্য নয়?'

খিল্-খিল্ করে হেসে উঠল গায়িকা। সায়মাও হাসল, তবে নিঃশব্দে। দুই ষণ্ডা অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, গম্ভীর। যেন এ জগতে নেই। লিফট থামতে বেরিয়ে এলো সবাই।

'আপনি কোন্ দেশী, মিস্টার...?' সায়মা বলল।

'ব্রুনো ডিয়েট্রিচ নাম, অস্ট্রিয়ান।'

নিখাদ বিস্ময় ফুটল দুই সুন্দরীর চেহারায়। 'অস্ট্রিয়ান!' মাথা দুলিয়ে চুল পিছনে সরিয়ে দিল গায়িকা। 'আমাকে চিনলেন কী করে?'

'ব্যবসার কাজে মাঝেমধ্যে মিডল ইস্টে আসা-যাওয়া করতে হয় আমাকে,' শ্রাগ করে বলল রানা।

'আই সী!'

'ভাষাটা বুঝি না, তবে আপনার গলা যে মিষ্টি, সেটুকু বুঝি।'

'থ্যাঙ্কস!' প্রশংসায় চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল গায়িকার। 'কিসের ব্যবসা আপনার?'

হেসে ফেলল ও। 'সব কথা এখনই শুনতে চান? ভবিষ্যতের জন্যে কিছু বাকি রাখলে হত না?'

'ও শিওর, শিওর!' ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল শিল্পী। নিজের আদেখলেপনায় একটু যেন লজ্জাও পেয়েছে। 'তাই থাকুক না হয়। দেখা হবে।'

পরস্পরের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে নিজ নিজ স্যুইটে ঢুকে পড়ল সবাই। দুই যণ্ডা বোঝার ভারমুক্ত হয়ে আগেই কেটে পড়েছে। অন্য ফ্লোরে আছে তারা। দরজা বন্ধ করার আগমুহূর্তে কী ভেবে পিছনে তাকাল রানা। চোখাচোখি হয়ে গেল সায়মার সাথে। সরাসরি তাকিয়ে ছিল মেয়েটা। ধরা পড়তে থতমত খেয়ে হাসল।

ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে নিঃশব্দে হাসল রানাও। একেই বলে শুভলক্ষণ। শুরুতেই যখন ভাগ্যের অযাচিত সাহায্য পাওয়া

গেল, তখন ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে, ভাবতে ভাবতে ব্রীফকেস রেখে টাইয়ের নট্ ঢিল করল। পরমুহূর্তে থাবা চালাল ফোনের রিসিভার লক্ষ্য করে। 'রূম সার্ভিস!'

পেটের ভেতর অনেক আগেই ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গেছে মাসুদ রানার।

ঘণ্টাখানেকের পিচ্চি এক ঘুম দিয়ে উঠে পড়ল ও। বেডরূম সংলগ্ন ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। গত কয়েকদিন টানা পরিশ্রম করতে হয়েছে, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে জেট ল্যাগের ধাক্কা। সব মিলিয়ে কাহিল অবস্থা। আরেকটু ঘুমানো গেলে ভাল হত, কিন্তু উপায় নেই।

হাই তুলে সামনে তাকাল ও। সূর্য ঢলে পড়েছে অনেকখানি। গরমের তেজও কমেছে কিছুটা। একটু গরম হলেও ফুরফুরে বাতাস আসছে ঈজিয়ান সাগর থেকে। সামনে নীল কাঁচের মত বিছিয়ে আছে সাগর। অল্প অল্প ঢেউ দিচ্ছে। অনেক দূরে বড় একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। চলছে, কিন্তু দেখে মনে হয় অনড় দাঁড়িয়ে।

মাছ ধরার ছোট-বড় ট্রলার প্রচুর। কিছু গভীর সাগরের দিকে যাচ্ছে, কিছু ফিরে আসছে। প্রত্যেকটার পিছনে লেগে রয়েছে ঝাঁক-ঝাঁক সী-গাল। দূর থেকে উড়ন্ত সাদা পালকের মত লাগছে ওগুলোকে।

খানিকপর রূমে ফিরে এলো ও। টেলিফোনে হোটেলের কার রেন্টাল সার্ভিসের সাথে কথা বলে তিনদিনের জন্যে একটা স্পোর্টস মডেল টু-সীটার জাগুয়ার ভাড়া করল। গাড়ির কাগজপত্র রেডি করতে বলে চা খেয়ে নিল ও, তারপর বাইরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো।

সেভিল রো-র তৈরি লাইট অ্যাশ কালারের ট্রপিক্যাল সুট

পরেছে ও, সাথে অফ হোয়াইট শার্ট এবং সাদা বুটিওয়ালা ম্যাজেন্টা রঙের টাই। পায়ে দিয়েছে নরম চামড়ার তৈরি বিশ্বের সবচেয়ে দামী শূ, সীব্যাগোস। সবশেষে চুল আঁচড়ে ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল নিজেকে। চোখ মটকাল। মন্দ লাগছে না।

স্যুইট ছাড়ার আগে আরেকবার ফোন তুলল রানা, অপারেটরকে একটা নম্বর দিয়ে অপেক্ষায় থাকল। প্রথম রিঙেই সাড়া দিল অন্য প্রান্ত।

'ভাস্কো দা গামা,' রানা বলল। 'সাগরের আবহাওয়া কেমন?'

'তিনদিন পর ঝড় উঠবে,' তৎক্ষণাৎ জবাব এলো।

'লাইফ সাপোর্টিং ইকুইপমেন্টস?'

'রেডি আছে। যখন ইচ্ছে চাইলেই পাবেন।'

'কত নম্বর সিগন্যাল?'

'তিন নম্বর।'

'ধন্যবাদ। নজর রাখবেন।' রিসিভার রেখে মুচকে হাসল মাসুদ রানা। ওর প্রথম প্রশ্নের অর্থ ছিল জাহাজ কখন ছাড়ছে, দ্বিতীয়টার অর্থ টিকেট। এবং শেষ প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে প্রতিপক্ষ কতজন। শেষ শব্দ দুটো অন্য কারণে উচ্চারণ করেছে ও।

স্যুইট ছেড়ে বেরিয়ে এলো। পুরু লাল কার্পেট মোড়া চওড়া করিডর ফাঁকা। এক ও দুই নম্বর স্যুইটের দরজার দিকে তাকাল—বন্ধ ভেতরে আছে ওরা, না বেরিয়ে গেছে? বাকি কেনাকাটা সারতে? ভাবল রানা। ধীর পায়ে লিফটের দিকে এগোল। নিচে এসে ডেস্কে চাবি জমা দেয়ার ফাঁকে কী-বোর্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। এক ও দুই নম্বর স্যুইটের চাবির হুক খালি। অর্থাৎ বের হয়নি মেয়ে দুটো। গুড!

বিশাল লাউঞ্জের এক মাথায় কার রেন্টাল সার্ভিসের কাঁচঘেরা অফিসে এসে ঢুকল রানা। সমস্ত কাগজপত্র তৈরিই ছিল. ওগুলোয়

সই করে VISA ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে তিনদিনের ভাড়া পরিশোধ করল ও। সাথে ফেরতযোগ্য জামানতের টাকাও। কাজ শেষ হতে গাড়িটা হোটেলের সামনে রেডি রাখতে বলে বেরিয়ে এলো ও। কফির অর্ডার দিয়ে লাউঞ্জে বসল মুখের সামনে খবরের কাগজ ধরে। নজর লিফট ব্যাঙ্কের দিকে।

পাঁচ মিনিট পর সায়মাকে দেখা গেল ওখানে, একা। দ্রুত পায়ে ডেস্কের দিকে যাচ্ছে। সাদা ট্রাউজার্স ও আকাশী রঙের টি-শার্ট পরে আছে সায়মা, পায়ে মাঝারি উচ্চতার হিল। হাতে বড় হাতব্যাগ ঝুলছে। চুল পনিটেইল করে বাঁধা। সব মিলিয়ে মোহনীয় লাগছে ওকে। ডেস্কে চাবি জমা দিয়ে কয়েক পা এগোল মেয়েটি, তারপর আচমকা ব্রেক কষল সামনেই ব্রুনো ড্রিয়েট্রিচকে দেখে।

ওর দামী বেশভূষা, দাঁড়ানোর ভঙ্গি আর মৃদু হাসি দেখে বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল সায়মার। কয়েক মুহূর্তের জন্যে জায়গায় জমে থাকল ও।

'হ্যালো!' হাসি খানিকটা চওড়া হলো রানার। 'আপনাকে মনে হয় কোথাও দেখেছি!'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে সায়মাও হাসল। 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।' রানাকে যত দেখছে, ধড়ফড়ানি তত বাড়ছে তার। বিশেষ কী যেন আছে যুবকের মধ্যে, চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে তাকে। 'কোথাও যাচ্ছেন, মিস্টার...?'

'শুধু ব্রুনো বলুন, প্লীজ।'

'আমাকে সায়মা বলবেন,' পনি টেইল দুলিয়ে বলল মেয়েটা।

'জরুরী কিছু কেনাকাটা করতে হবে,' মাথা নেড়ে কথার খেই ধরে বলল রানা। 'জাহাজ ঘাটেও যেতে হবে, তাই...' থেমে গেল ইচ্ছে করে।

সায়মার চোখের পাতা দ্রুত কয়েকবার পিট-পিট করে উঠল-

'দুদিন পর জাহাজে আলেকজান্দ্রিয়া যাচ্ছি। টিকেট কালেক্ট করতে হবে।'

'কোন জাহাজে?' গলার স্বর প্রায় বুজে এসেছে সায়মার।

'সান লাইন শিপিং কোম্পানির,' বলে তর্জনীর ডগা দিয়ে কপালের পাশে দুটো টোকা দিল রানা। 'কী যেন নাম!'

'স্টেলা সোলারিস?' অজান্তে ঢোক গিলল সায়মা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! ঠিক তাই। আজই বুকিং দিয়ে রাখা টিকেট কালেকশনের শেষ দিন, তাই বেরোচ্ছিলাম। আপনি কোনদিকে?'

'আমিও তো একই কাজে বেরিয়েছি!' বিস্ময় হজম করে বলল মেয়েটা। 'কিছু শপিং করতে হবে, তারপর...'

'তারপর?'

'একই জাহাজের টিকেট কালেক্ট করা।'

এক ভুরু সামান্য উঁচু করে ওকে দেখল রানা। 'অর্থাৎ?'

'আমরাও একই জাহাজে যাচ্ছি,' রানাকে 'হতবাক' করে দিয়ে বলল সায়মা।

'মিয়েন গট (মাই গড)!' চোখ কপালে তুলে বলল ও। 'সৌভাগ্য দেখছি পিছু ছাড়তেই চাইছে না এবার! সত্যিই তো, নাকি...'

'অফকোর্স সত্যি!'

'তা...' মেয়েটার মাথার ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল রানা। 'আপনি একাই চললেন নাকি? আর কেউ যাচ্ছে না সাথে?'

'না। নীলের অন্য কাজ আছে, আমাকে একাই যেতে হবে।'

'নীল?'

হাসল সায়মা। 'ওটা তাবাসসুমের ডাক নাম

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'মনে হচ্ছে আপনাদের নীল নদের সাথে নামটার কোন সম্পর্ক আছে

'ঠিক ধরেছেন,' মাথার ঝাঁকিতে পনিটেইল দুলে উঠল সায়মার। 'একবার নীলনদে জাহাজ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন ওর বাবা-মা। সেই জাহাজেই ওর জন্ম। তাই...'

'বুঝেছি। তা আপনি চাইলে আমার সাথে আসতে পারেন। সামনে গাড়ি আছে আমার।'

'ইয়ে...আপনার সাথে?' একটু যেন দ্বিধায় পড়ে গেল সায়মা।

'অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।'

'না, না, আপত্তি কিসের?' ব্যস্ত হয়ে উঠল সায়মা। 'কোন আপত্তি নেই। কিন্তু...এক মিনিট, প্লীজ! নীলকে ফোনে খবরটা জানিয়ে আসছি। আমি নেই, অথচ আমাদের গাড়ি হোটেলের পার্কে পড়ে আছে, জানলে ঘাবড়ে যাবে ও। একটু দাঁড়ান, প্লীজ!'

'শিওর!' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।'

পাঁচ মিনিট পর ফিরল মেয়েটা চঞ্চল কিশোরীর মত ছটফটে ভাব নিয়ে। রানাকে টকটকে লাল রঙের একটা হুড খোলা জাগুয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাসিমুখে হাত নাড়ল দূর থেকে। গাড়ির চেহারা সুরতে খুশিই হলো সায়মা, কিন্তু ওটা টু-সীটার দেখে ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখল। 'আপনি ড্রাইভ করবেন?'

হেসে কুর্নিশের ভঙ্গি করল ও। 'ভাববেন না। ড্রাইভার হিসেবে আমি খুব খারাপ নই।'

'আমি বলতে চাইছিলাম,' ব্যাগটা প্যাসেঞ্জারস সীটে রেখে দরজা খুলল মেয়েটা। 'এ শহরের রাস্তাঘাট একা চলার মত চেনেন কী করে আপনি।'

'ব্যবসার কাজে এদিকেও প্রায়ই আসা হয় যে আমার।' উঠে বসে স্টার্ট দিল রানা। চমৎকার টিউন করা এঞ্জিন, প্রায় নিঃশব্দে গড়াতে শুরু করল জাগুয়ার। 'তাই মোটামুটি কাজ চালাবার মত চিনি আর কী।'

পাশ থেকে রানাকে দেখল কিছুক্ষণ মেয়েটা। 'খুব বড় ব্যবসা বুঝি আপনার?'

'কী যে বলেন! কোনরকমে পেটে ভাতে চলে যায়!'

'হুঁম!' ঠোঁট টিপে হাসল ও। 'সে তো চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি।'

গিয়ার বদলে গাড়ি চালনায় মন দিল রানা। অফিস-আদালত ছুটি হওয়ায় প্রচণ্ড রাশ চলছে এখন, গাড়ি আর পায়ে চলা মানুষের চাপে যাচ্ছেতাই অবস্থা। জায়গায় জায়গায় ট্রাফিক জ্যাম। খানিক পর বিরক্ত হয়ে ঘুরপথে এগোবে ঠিক করল রানা, ফাঁক-ফোকর দিয়ে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে এলো মূল শহরের বাইরে। ঈজিয়ান সাগরের তীরঘেঁষা এথেন্স-মেগারা হাইওয়ে ধরে বন্দরের দিকে চলল।

এটা নতুন রাস্তা, তারওপর বেশ প্রশস্ত। এ মুহূর্তে প্রায় ফাঁকা। সূর্যাস্ত দেখতে ইচ্ছুকরা ছাড়া তেমন কেউ নেই। কাজেই তুফান বেগে গাড়ি ছোটাল রানা। তীব্র বাতাসে চুল উড়ছে ওদের, গায়ের সাথে বাড়ি খেয়ে অনবরত ফড়ফড় আওয়াজ করছে শার্ট-কোট। রানার টাই পতাকার মত উড়ছে পিছনে। গায়ের সাথে টি-শার্ট সেঁটে থাকায় অস্বস্তি লাগছে সায়মার, দু'হাত বুকে বেঁধে বসে আছে ও।

দশ মিনিট পর বন্দরে পৌঁছল ওরা। সান লাইন শিপিং কর্পোরেশনের অফিস ভবনের সামনে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকল। এখানেও রানার জন্যে আরেক 'চমক' অপেক্ষা করছিল। দেখা গেল জাহাজেও খুব কাছাকাছি স্যুইট বুক করেছে দু'পক্ষ। বোট ডেক স্যুইট ওগুলো। অবস্থা দেখে সায়মাও তাজ্জব হলো এবার।

'এ কী করে হয়!' কাজ সেরে অফিস থেকে বেরিয়ে এসে অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'এতগুলো দৈব-সংযোগ...?'

'আমিও তো তাই ভাবছি,' রানা বলল। 'ঈশ্বর নিশ্চই চাইছেন

আমরা পরস্পরের কাছাকাছি থাকি। ভদ্রলোকের আরও কোন ইচ্ছে আছে কী না কে জানে!' সায়মার জন্যে গাড়ির দরজা মেলে ধরল ও। 'উঠুন। এবার শপিং করতে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ.' মাথা নাড়ল সায়মা। একটু হাসল বটে, কিন্তু তাতে আগের মত প্রাণের ছোঁয়া দেখতে পেল না রানা। চিন্তিত মনে হচ্ছে ওকে।

সন্ধে হয়ে গেছে বেশ আগেই। বীচ রোড ধরে ফিরছে রানা. মাঝারি গতিতে চলল এবার।

মাঝে যথেষ্ট ব্যবধান রেখে একটা গাড়ি অনুসরণ করছে ওদেরকে. খেয়াল করেনি কেউ। হোটেল থেকেই পিছু নিয়েছে ওটা আরও অনেকটা পিছনে যে আরেকটা গাড়ি আসছে, সেটা খেয়াল করেনি অনুসরণকারীও।

পাঁচ

দু'জনের কেনাকাটা শেষ হতে রাত ন'টা বেজে গেল। সায়মা নিজের জন্যে তেমন কিছু কেনেনি. প্রায় সবই বান্ধবীর জন্যে কিনেছে দুপুরে সময়ের অভাবে যে সমস্ত আইটেম কেনা হয়নি, সেইসব। রানা কিনল আধ ডজন করে শার্ট. প্যান্ট. টাই. আন্ডারওয়্যার ও সিলকের রুমাল। এছাড়া স্লীপিং সুট. স্লিপার ইত্যাদিও কিনল। সবশেষে কিনল দুই সেট ট্রপিক্যাল কমপ্লিট সুট এত জিনিস, বড়সড় এক সুটকেস ভরে উপচে পড়ার মত.

অবস্থা হলো শেষ পর্যন্ত।

ওর খরচের বহর দেখে বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল সায়মার। 'চাঁদে যাওয়ার প্ল্যান আছে নাকি?' চুপ থাকতে না পেরে এক সময় বলে উঠল ও। 'এতসব কিসের জন্যে?'

মুচকে হাসিল রানা। 'তাড়াহুড়ো করে আসতে হয়েছে বলে সাথে করে প্রায় কিছুই আনতে পারিনি। সব লন্ডনে ফেলে আসতে হয়েছে। না কিনে উপায় ছিল না। যাক, মামলা ফিনিশ। এবার কী করা যায় বলুন তো?'

'আরও কিছু বাকি রয়ে গেল নাকি?' ভুরু কোঁচকাল সায়মা।

'হ্যাঁ, পেটপুজো। সাপারটা সেরে নিলে ভাল হত না? যদি আমার মেহমানদারীতে আপনার আপত্তি না থাকে আর কী!' নিজের গলার স্বরে অকৃত্রিম আন্তরিকতা টের পেয়ে অবাক হলো রানা। বুঝল, মেয়েটাকে ভাল লাগতে শুরু করেছে ওর।

'নেই আপত্তি,' সায়মা বলল। 'চলুন।'

'ধন্যবাদ। ইটালিয়ান ফুডস হলে কেমন হয়?'

'ইটালিয়ান? উঁম, তা মন্দ হয় না।'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। মিনিট দশেক গাড়ি ছুটিয়ে শহরের কোলাহল থেকে একটু দূরে, পরিচিত এক ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে থামল রানা। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, হাইওয়ের পাশে। রাত বাড়লেও খদ্দেরের চাপ কমেনি। সামনের একদিকে বেশ কিছু গাড়ি পার্ক করা, অন্যদিকে টেবিল ফেলে খোলা আকাশের নিচে বসার ব্যবস্থা করা আছে। খাটো খাটো পিলারের মাথায় অল্প ওয়াটের নীলচে আলো জ্বেলে আলোকিত করা হয়েছে জায়গাটা। চমৎকার পরিবেশ।

'এত থাকতে এখানে?' বলল সায়মা।

'এত ভাল ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট সারা গ্রীসে দ্বিতীয়টি পাবেন না,' এঞ্জিন অফ করে দিল রানা। 'এ ক্লাস রান্না এদের।'

খোলা জায়গায় দশ-বারোটা টেবিল পাতা আছে, তার চারটে দখল করে আছে চার জোড়া বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ। আরেকটায় রয়েছে দুই বৃদ্ধ। ওদের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাল না কেউ, খাওয়ায় ব্যস্ত। একটা নিরিবিলি টেবিলে বসল রানা-সায়মা। প্রায় একই মুহূর্তে আরেকটা গাড়ি এসে দাঁড়াল কার পার্কে, দুই লম্বা-চওড়া যুবক নামল ওটা থেকে। কোনদিকে না তাকিয়ে ওদের গজ দশেক দূরের এক টেবিলে বসে পড়ল। ঘন ঘন রানার দিকে তাকাচ্ছে। রানার খেয়াল নেই সেদিকে, অর্ডার দিতে ব্যস্ত।

'ওই লোক দুটোকে কোথায় যেন দেখেছি,' ওয়েটার বিদেয় হতে বলল সায়মা। গলার স্বরে অস্বস্তি।

'কোন লোক দুটো?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'আপনার বাঁ দিকে, এইমাত্র এসে বসেছে।'

ঘুরে তাকাতে যাচ্ছিল ও, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। 'দু'জন?' সায়মাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে আবার বলল, 'কী করছে?'

'কফি খাচ্ছে। ঘন ঘন তাকাচ্ছে আপনার দিকে।'

'আমার দিকে?' মৃদু হাসল রানা। 'ভুল দেখেছেন। নিশ্চই আপনাকে দেখছে শয়তানগুলো।'

'না, ব্রুনো,' গম্ভীর হয়ে উঠল মেয়েটা। 'আপনাকেই দেখছে। এদের আগে কোথাও দেখেছি আমি। চেনা চেনা লাগছে।'

'আপনি শিওর?' ভুরু কুঁচকে উঠল ওর।

'হ্যাঁ। কোন সন্দেহ নেই। চাউনি ভাল মনে হচ্ছে না লোক দুটোর।'

মেয়েটা ঘাবড়ে গেছে বুঝতে পেরে হাত বাড়াল রানা, মৃদু চাপ দিল তার হাতে। রানার উষ্ণ স্পর্শে একটু যেন শিউরে উঠল সায়মা। 'ঘাবড়াবেন না। তাকাবেন না ওদের দিকে, আমি দেখছি।'

কোটের বাঁ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে গিয়ে ইচ্ছে করে ফেলে দিল ও। 'মাফ করবেন,' বলে ঝুঁকে ওটা তুলে নেয়ার ফাঁকে লোক দুটোকে দেখে নিল। কিন্তু আলোর স্বল্পতার কারণে তাদের চেহারা দেখা গেল না ঠিকমত। তবে দু'জনেই যে দীর্ঘদেহী, তা বুঝতে কোন অসুবিধে হলো না।

'মনে পড়েছে!' নিচু গলায় বলল সায়মা, উত্তেজনায় গলা কাঁপছে। 'ওদেরকে শপিঙের সময় দেখেছি আমি, মার্কেটে। আমাদের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করছিল।'

চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল রানার। 'ঠিক আছে। ঘন ঘন তাকাবেন না। এখান থেকে বের হওয়ার পরও যদি ওরা আমাদের পিছু না ছাড়ে, তখন দেখা যাবে। খেয়ে নিন।'

খেল ওরা, কিন্তু জমল না। উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে সায়মা, গলা দিয়ে ঠিকমত নামছে না কিছুই। ওর অবস্থা দেখে রানারও রুচি নষ্ট হয়ে গেল। বিল মিটিয়ে উঠি-উঠি করছে ও, এমন সময় এক যোগে উঠে দাঁড়াল লোক দুটো। সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। সশব্দে আঁতকে উঠল মেয়েটা। 'ব্রুনো...' আর আর কিছু গলা দিয়ে বের হলো না। সম্ভবত সাহায্যের আশায় এদিক-ওদিক তাকাল ও, কিন্তু কারও দেখা পেল না। আশপাশের সব টেবিল কখন খালি হয়ে গেছে, খেয়ালই করেনি। কেউ নেই ধারেকাছে।

অনুমতির তোয়াক্কা না করে ওদের পাশে বসে পড়ল লোক দুটো। রানার চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা ওরা দু'জনেই, পাশে প্রায় দ্বিগুণ। গায়ের রং তামাটে। একজনের বয়স ত্রিশের মত, তাকেই লীডার মনে হলো রানার। মুখটা প্রকাণ্ড, কপালে বিশ্রী একটা কাটা দাগ। অন্যজনের বয়স একটু কম, চৌকো মুখ তার। নাকের হাড় ভাঙা, মাঝখানটা বসা। সায়মার বুকের ওপর সেঁটে আছে তার নির্লজ্জ চোখ, থেকে থেকে ঠোঁট চাটছে লোভীর মত।

আচমকা ভোজবাজীর মত একটা পিস্তল উদয় হলো লীডারের হাতে। টেবিলের তলা দিয়ে সায়মার পেটে ঠেসে ধরল ওটা। 'খবরদার! টুঁ শব্দ করলে জানে শেষ করে দেব,' প্রায়-দুর্বোধ্য ইংরেজিতে বলল সে।

তীব্র আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল মেয়েটা, কাঁপছে ঠক্-ঠক্ করে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে যে-কোন মুহূর্তে।

'কী চাও, তোমরা?' রানা বলল শান্ত গলায়।

'প্রথমে তোমার ক্রেডিট কার্ড, ক্যাশ যা আছে, সব। তারপর তোমার বান্ধবীরগুলোও।'

হাসল রানা। 'এই জন্যেই সন্ধে থেকে পিছু নিয়েছ আমাদের? তোমরা তাহলে ছিনতাইকারী? আমি আরও ভাবছিলাম কে না কে! তা, কী বলছিলে যেন?'

দ্বিতীয়জনের চোখ জায়গা বদল করে রানার মুখের ওপর এসে স্থির হলো। 'ফাজলামো হচ্ছে, না?' চাপা গর্জন ছাড়ল সে। ভ্যাঙালো রানাকে, 'কী বলছিলে যেন! কানে কম শোনো?'

ঠাণ্ডা চোখে যুবককে দেখল রানা। 'আরেকবার এরকম অসভ্যতা করলে, নাকটা তো আগেই গেছে, এক চড়ে কান ফাটিয়ে দেব তোমার, বদমাশ কোথাকার!'

কথাটা কানে যেতেই শক্ত হয়ে গেল সায়মা, চোয়াল ঝুলে পড়ল। ভয়ে ভয়ে একবার ওর দিকে, একবার যুবকের দিকে তাকাতে লাগল। ওদিকে কথাটা যাকে বলা, তার অবস্থা হয়েছে দেখার মত। রানার হুমকি শুনে হাসবে না কাঁদবে, বুঝে উঠতে পারছে না সে। তাকে পাত্তা না দিয়ে প্রথমজনের দিকে ফিরল রানা। 'আবার বলো কী বলছিলে।'

একটু যেন দ্বিধায় পড়ে গেল লোকটা। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, 'বলছি, তোমাদের ক্রেডিট কার্ড, ক্যাশ, সব বের করে টেবিলের ওপর রাখো ভাল মানুষের মত।'

'কেন?'

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল লীডারের চেহারা। 'দেখো, মিস্টার। এখানে তোমাকে সাহায্য করার কেউ নেই। চ্যাঁচালেও কেউ আসবে না। নিজেদের ভাল চাও তো যা বলছি তাই করো। দিয়ে দাও সব, নইলে...'

'নইলে কী করবে?' শান্ত গলায় বলল ও। মনে মনে ওদের আর নিজের দূরত্বের মাপজোক করছে। দেহের প্রতিটা পেশী টানটান।

'শালা বানচোত!' তড়াক করে উঠে দাঁড়াল দ্বিতীয়জন, হাতে খোলা ছুরি। 'আজ তোর...' অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ওটা চালাল সে রানার বুক সই করে। ভয়ে চিৎকার করে উঠে চোখ বুজে ফেলল সায়মা। ওদিকে ছুরি এগিয়ে আসছে দেখে বসা অবস্থাতেই এক ঝটকায় সামনে থেকে সরে যেতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পুরোপুরি সফল হলো না। বাঁ কাঁধে আগুন ধরে গেল যেন, অজান্তেই গুঙিয়ে উঠল ও।

পরক্ষণে হাত চালাল ও। ছুরি লক্ষ্যচ্যুত হওয়ায় সামনে ঝুঁকে এসেছিল যুবক, সঙ্গে সঙ্গে তার ভাঙা নাকে ভয়ঙ্কর এক ঘুসি ঝেড়ে দিল। একই মুহূর্তে লাথি মেরে চেয়ারসহ লীডারকে ফেলে দিল মাটিতে। মুঠো থেকে পিস্তল উড়ে গেল তার। চেয়ারের হাতলের আঘাতে বুকে ব্যথা লাগায় মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে লোকটা। ওদিকে নাকে আচমকা ব্যাটারিং র‍্যামের ঘা খেয়ে যুবকও শুয়ে পড়েছিল, কিন্তু ছুরি ছাড়েনি।

অবস্থা লেজেগোবরে বুঝতে পেরে তড়াক করে উঠে পড়ল সে। নাক ফেটে দরদর করে রক্ত গড়াচ্ছে। বুকের কাছে শার্টে ঝরে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে তার সব মিলিয়ে। এদিকে রানাও রক্তাক্ত। ওর বাঁ কাঁধ রক্তে ভিজে উঠেছে, অবশ্য আলোর অভাব আর সুটের রঙের কারণে

আঘাতের গুরুত্ব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। অন্যদিকে সায়মা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে, সাহায্যের আশায় চিৎকার করবে ভাবছিল ও।

কিন্তু রানা ব্যাপার টের পেয়ে হাত নেড়ে নিষেধ করল। রাগে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ওর। 'সরে যাও সামনে থেকে।'

কথাটা শেষ হয়েছে কী হয়নি, ছুরি বাগিয়ে আবার ছুটে এলো যুবক। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করল রানা, তারপর চিতার মত এক লাফে সামনে থেকে সরে গেল। দ্বিতীয় দফা মিস করে এগিয়ে যাওয়ার সময় পাশ থেকে তার চোয়ালে শক্ত এক সাইড কিক ঝেড়ে দিল রানা। এমনিতেই টলমলো অবস্থা ছিল, তারওপর লাথিটা খেয়ে উড়ে গেল সে।

পরমুহূর্তে পিছন থেকে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লীডার, হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা। ঝাঁকিতে ওর কোটের পকেট থেকে কিছু একটা ছিটকে বেরিয়ে এসে সায়মার কয়েক হাত দূরে পড়ল। কাছে গিয়ে চট করে জিনিসটা তুলে নিল ও। দেখল, রাবার ব্যান্ডমোড়া ছোট একটা নোট বই। তাড়াতাড়ি ওটা নিজের হাতব্যাগে রেখে মুখ তুলে তাকাল।

আক্রমণকারীকে শোয়া অবস্থায় দেখতে পেল ও। মনে হলো অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার মাথার কাছে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে ব্রুনো। হাতে পিস্তল। ওকে শায়েস্তা করতে আরেকবার এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল রক্তাক্ত যুবক, পিস্তল দেখে আপনা থেকেই 'হ্যান্ডসআপ' হয়ে গেল। ছুরি খসে পড়ল হাত থেকে।

মাত্র দশ সেকেন্ডে লড়াই খতম।

"পুলিসের হাতে পড়তে না চাইলে লোকজন আসার আগেই কেটে পড়ো এটাকে নিয়ে," অস্ত্র নাচিয়ে যুবককে বলল রানা। মাঝারি গোছের একটা লাথি মারল অজ্ঞান লোকটার পাঁজরে। 'হারি আপ!'

'ছেড়ে দিচ্ছেন!' বিস্মিত গলায় বলল সায়মা। 'ছাড়বেন না!

ওদের পুলিসের হাতে তুলে দিন।'

'দিতে পারলে ভালই হত,' বলল ও। 'কিন্তু তাতেও ঝামেলা কম নয়। কৈফিয়ত দিতে দিতে আমাদেরই জান খারাপ হয়ে যাবে।'

'তবু, ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না,' আপত্তি জানাল মেয়েটা। 'অনেক বড় অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারত আজ এরা এতবড় কাণ্ড ঘটানোর পরও ওদের ছেড়ে দিলে...'

'বাদ দাও। এখন পুলিসের চেয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া বেশি জরুরী আমার জন্যে এদের...' খুব কাছেই একটা বিস্মিত কণ্ঠ শুনে থেমে গেল ও।

লোকটা ওয়েটার। তার পেছনে জনা চারেক লোক জুটে গেছে তামাশা দেখতে। একজন খদ্দেরকে মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওয়েটার। 'মাই গড! কী হয়েছে ভদ্রলোকের?'

'তেমন কিছু না,' ওয়ালথারটা দ্রুত পকেটে পুরে বলল রানা। 'হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন।'

কানে গেল না ওয়েটারের, হাঁ করে রক্তাক্ত যুবককে দেখছে। 'এ কী!' সংবিৎ ফিরতে বলল। 'আপনার কী হয়েছে!'

'ট্রাকের সাথে ধাক্কা খেয়েছে,' এবারও রানাই জবাব দিল। চেহারা নির্বিকার। 'তাড়াতাড়ি এদেরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো।'

কিছুক্ষণ বোকার মত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়েটার, তারপর একে একে অন্য তিনজনকে দেখল ভেতরে আর কোন ব্যাপার আছে কী না বোঝার চেষ্টা করছে

পরদিন সকাল দশটায় সায়মার নকের শব্দে ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার। উঠে টলতে টলতে গিয়ে দরজা খুলে দিল ও। টান লাগায় বাঁ কাঁধের ক্ষতস্থানটায় ব্যথা লাগল. চোখমুখ কোঁচকাল।

'হ্যালো! গুড মর্নিং।'

'ভেতরে আসতে পারি?' বলল মেয়েটা। একটা হাত দেহের পিছনে, চেহারায় হাসি হাসি ভাব।

'অবশ্যই!' দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল ও।

'ব্যথা কমেছে?' ভেতরে এসে রানার কাঁধের ব্যান্ডেজটা দেখল সায়মা। রাতে হোটেলে ফেরার পথে ক্ষতটায় ড্রেসিং করানো হয়েছিল। কিছু পেইনকিলারও দিয়েছিল ডাক্তার। ভাগ্য ভাল যে অল্পের ওপর দিয়ে গেছে ধাক্কাটা, তেমন গভীর হয়নি ক্ষত।

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ। বোসো।'

একটা সোফায় বসল মেয়েটা। 'এটা ফেরত দিতে এলাম।' দেহের আড়াল থেকে হাত বের করে আনল, রানার নোটবইটা ধরা আছে ওর হাতে। 'কাল রেস্টুরেন্টে মারামারির সময় তোমার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল এটা। রাতেই ফেরত দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু মনে ছিল না।'

'ধন্যবাদ,' তাড়াতাড়ি ওটা নিল রানা। বিব্রত হাসি হাসল। 'কাল থেকে এটা খুঁজে খুঁজে হয়রান আমি। জরুরী কিছু হিসেবপত্র আছে। 'এক মিনিট,' বলে দ্রুত বেডরুমে ঢুকে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরই ফিরল ও, খালি হাতে।

মাথা নাড়ল সায়মা। 'ওটার মধ্যে কিছু আলগা কাগজপত্র ছিল, সব ঠিক আছে কী না দেখে নিলে না?' ওকে অপ্রস্তুত হতে দেখে আবার বলল, 'তুমি তাহলে অস্ত্র ব্যবসায়ী? এই জন্যেই কাল পুলিসের কাছে যেতে চাওনি?'

'তুমি তাহলে ওগুলো দেখেছ?' ওর কথায় বিরক্তির আভাস ফুটল।

'ইচ্ছে করে দেখিনি,' তাড়াতাড়ি বলল সায়মা 'রাবার ব্যান্ড ছিঁড়ে ভেতরের কাগজপত্র বেরিয়ে পড়েছিল। ওর মধ্যে তোমার

ছবিওয়ালা লন্ডন টাইমসের একটা নিউজ কাটিং দেখে পড়ার লোভ সামলাতে পারিনি। সরি।'

'দ্যাট'স অল রাইট। তবু ভাল যে জিনিসটা তোমার হাতে পড়েছিল। আর কেউ জানে ওটার কথা?'

'না,' বলল সায়মা। কেমন এক ঘোর লাগা দৃষ্টিতে ওকে দেখছে। 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে ধন্যবাদ। নিউজটায় পড়লাম ওরা তোমার লন্ডন উপস্থিতির ব্যাপারটা টের পেয়ে গিয়েছিল।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'সে জন্যে ওদের ধন্যবাদ দিতে হবে কেন? ওদের ভয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে হলো, আর তুমি...'

'সেই জন্যেই তো ধন্যবাদ দিতে হবে,' হেসে উঠল সায়মা। 'ওদের তাড়া খেয়েই না এখেনে পালিয়ে এলে তুমি! নইলে কি তোমার-আমার দেখা হত কোনদিন?'

'আচ্ছা! একেই বলে কারও পৌষ মাস আর কারও সর্বনাশ।'

এবার হাসল না ও। গম্ভীর, চিন্তিত। 'কুনো, টাইমস লিখেছে তুমি প্যালেস্টাইনীদের কাছে সস্তায় অস্ত্র বিক্রি করো। সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

একটু ভাবল ও। 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ওরা, তাই।'

খানিক পর উঠল সায়মা। 'এখন চলি। নীলের ঘুম ভাঙাতে হবে। ও হয়তো দেখতে আসবে তোমাকে। খবর শুনে রাতেই আসতে চেয়েছিল, আমি আসতে দিইনি।'

'কেন?' একটু অবাক হলো ও।

'এমনিই,' বলে মুখ নামিয়ে নিল মেয়েটা। কিন্তু ওর দু'গালের রক্তিম আভা ঠিকই দেখে ফেলল রানা। ভাবল, ব্যাপার কী?

'তোমার শরীর ভাল ছিল না,' আবার বলল সায়মা। 'তাই

'ভাল করেছ। ধন্যবাদ।'

দিনে নয়, সন্ধের পর রানাকে দেখতে এলো আব্বাসকুম। সাথে মুফতি তমিজউদ্দিন। সাপ দেখলে গায়ের মধ্যে যেমন শিরশির করে, লোকটাকে দেখামাত্র তেমনি অনুভূত হলো রানার। ভদ্রতার খাতিরে তার সাথে হ্যান্ডশেক করল, সঙ্গে সঙ্গে গায়ের মধ্যে ঘিন-ঘিন করে উঠল ওর।

'সায়মার মুখে কালকের ঘটনা শুনলাম,' তমিজউদ্দিন বলল। 'খুবই বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলেন, সাহেব। কাঁধের অবস্থা কেমন এখন?'

'একটু ভাল।'

'ব্যথা কমেছে?' গায়িকা বলল।

'হ্যাঁ।'

'যাক! ওহ্, সায়মা আপনার কীর্তি সম্পর্কে যা বলল, এতদিন জানতাম সে-সব কেবল সিনেমাতেই হয়।'

মিনিট দশেক পর বিদেয় নিল ওরা। তক্ষুণি বাথরুমে ঢুকল রানা। আধঘণ্টা ধরে আচ্ছাসে গোসল করল। তারপরও মনে হলো ঘিন-ঘিনে ভাবটা পুরোপুরি দূর হয়নি। খানিকটা রয়েই গেছে।

ছয়

সান লাইন কোম্পানির স্টেলা শ্রেণীর লাক্সারি লাইনার তিনটে

তার মধ্যে স্টেলা সোলারিস সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে সুন্দর। সামনের দিকে পাঁচ ডেক জুড়ে আছে প্রচুর কেবিন, তার ওপরে বোট ডেক। অনেকটা টপ ড্রয়ারের মত। এগুলোর একেকটা প্রাইভেট স্যুইটের ভাড়া অবিশ্বাস্য।

ওর একটায় উঠেছে মাসুদ রানা। তমিজউদ্দিন, তাবাসসুম ও সায়মাও আলাদা আলাদা বোট ডেক স্যুইটে আছে, ওরটার উল্টোদিকে।

তিনটেয় এমবার্কেশন শুরু হলো, ও উঠল চারটের একটু আগে। পাঁচটার মধ্যে জিনিসপত্র গোছগাছ করে পোশাক বদলে নিল। এমন সময় মৃদু নক হলো দরজায়। 'কাম ইন!' হাঁক ছাড়ল রানা।

সায়মা। সাদা রঙের সাধারণ এক লিনেন ড্রেস পরে আছে মেয়েটা। চুল বেঁধেছে দুটো বেণী করে, বেণীর প্রান্তে সাদা ফুলের ছোট্ট গোছা। মুখে মেক-আপ বলতে গেলে নেই, শুধু ঠোঁটে লিপস্টিকের হালকা প্রলেপ। ওতেই দেখতে অসাধারণ লাগছে মেয়েটিকে।

'এসো,' বলল রানা। 'ড্রিঙ্কস?'

'না, ধন্যবাদ,' মাথা নাড়ল সায়মা। প্রকাণ্ড কাউচের মাথায় বসল। 'একটা খবর দিতে এলাম। ইনভিটেশন।'

'যেমন?'

'জাহাজ ছাড়ার আগে ছোটখাট এক ড্রিঙ্ক পার্টির আয়োজন করেছি আমরা, ফরওয়ার্ড লাউঞ্জে। তোমাকে তাতে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে নীল।'

'কখন?' ওর মুখোমুখি বসল রানা।

'এই তো আর কয়েক মিনিট পর। আমি তোমাকে নিতে এসেছি। কিন্তু তার আগে...'

'কিছু কথা আছে, ঠিক? বলে ফেলো।'

'ইয়ে...আমি কিন্তু তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাপারে জানিয়েছি নীলকে। তোমার পালিয়ে বেড়ানোর কথাও বলেছি। ও...মানে, খুব সহজেই তোমার মত পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়।'

'বিপজ্জনক পুরুষের প্রতি?'

'উঁম, হ্যাঁ।' হাসির আভাস ফুটল সায়মার মুখে। 'ওর এক ধরনের ইয়ে আছে...ওয়েল, অনেকটা খেলার ছলে...'

'কী!'

'কখনও কখনও মনে হয়, ও বুঝি আমার সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্যেই...'

হো-হো করে হেসে উঠল রানা। 'তুমি বলতে চাইছ, নীল আমাকে বিছানায় নেয়ার চেষ্টা করতে পারে? এই ভয়ে কাল রাতে আমার ঘরে আসতে ওকে বাধা দিয়েছিলে?'

দু'গালে খুব দ্রুত লালচে আভা ফুটল সায়মার। 'হ্যাঁ। ড্যাম ইউ!'

আবার শব্দ করে হেসে উঠল রানা। 'খুব খারাপ কথা! দারুণ এক অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছ তুমি,' মেয়েটাকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকাতে দেখে আবার হাসল। 'কিন্তু, মাই ডিয়ার সায়মা, জাহাজে অমন কাজ ও করবে বলে মনে হয় না। আফটার অল, বয়ফ্রেন্ড সঙ্গে আছে এখন।'

একটু পর প্যাসেজওয়েতে বেরিয়ে এলো ওরা। মেইন লাউঞ্জ হয়ে বো-র খুব কাছের 'এ' ক্লাস লাউঞ্জে এসে পৌঁছল। পুরো লাউঞ্জের চারদিকে ঝুলছে পুরু বাদামী ভেলভেটের ড্রেপার, প্রত্যেকটা টেবিলে সাজানো রয়েছে টকটকে লাল ফুলের বড় বড় তোড়া। এরই মধ্যে সুবেশধারী নারী-পুরুষে ভরে উঠছে লাউঞ্জ। চাপা গুঞ্জন চলছে।

তাবাস্সুমের নামে রিজার্ভ করা একটা খালি টেবিলে নিয়ে এলো ওকে সায়মা, মুখোমুখি বসল দু'জনে। ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল

রানা, চারদিকে তাকাল। 'এরা কারা?' বলল চাপা গলায়। কেন যেন খুঁতখুঁত করছে মন।

মৃদু শ্রাগ করল সায়মা। 'বেশিরভাগই নীলের ভক্ত। অল্প কয়েকজনকে চিনি।'

ড্রিঙ্ক আসতে চুমুক দিল ওরা। 'হোস্টের খবর নেই যে?' রানা বলল। এবং সাথে সাথেই দেখতে পেল গায়িকাকে। প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে নিজের টেবিল খুঁজছে। তার একটু পিছনে রয়েছে তমিজউদ্দিন। সাদা সামার ড্রেসে লোকটাকে ভদ্রবেশী চোরের মত লাগছে ওর চোখে।

তাবাস্‌সুম জ্বলজ্বলে নীল ড্রেস পরেছে আজ। এতই লো-কাট্ যে বুকের সামান্যই ঢাকা পড়েছে। একটু পর রানা-সায়মার ওপর চোখ পড়তে চওড়া হাসি ফুটল তার মুখে, হাত নেড়ে এগিয়ে আসতে লাগল। হাতের ব্রেসলেট ও একাধিক হিরের আংটি ঝিকিয়ে উঠল আলোয়। গলায় একটা সরু চেইন ছাড়া কিছু পরেনি আজ গায়িকা। কানে নীল রঙের ছোট্ট দুটো পাথর বসানো ফুল। থেমে থেমে এর-তার সাথে সৌজন্যমূলক দুয়েকটা কথা বলতে বলতে আসছে সে। তমিজউদ্দিন লেগে আছে পায়ে পায়ে।

কাছে এসে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল গায়িকা। 'হ্যাল্লো, ব্রুনো! হাউ ডু ইউ ফীল টুডে?'

'ফাইন, থ্যাঙ্ক ইউ,' তার হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল ও। মেয়েটা এত বেশি ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে যে ওর গোটা বুক পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। তার পরেও দৃষ্টিপথ আগলে রেখেছে এমনভাবে, আর কোনদিকে তাকাবারও সুযোগ নেই তবু সায়মার মৃদু ভ্রুকুটি ওর মধ্যেও ঠিকই দেখতে পেল রানা। তমিজউদ্দিনকেও খুব একটা সন্তুষ্ট মনে হলো না।

বান্ধবী বসতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে। 'আপনার কাঁধের অবস্থা কী?' হ্যান্ডশেক সেরে সে-ও বসল। 'কমেছে কিছুটা?'

'প্রায় নেই হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'তেমন টের পাচ্ছি না। ধন্যবাদ।'

পানের ফাঁকে ফাঁকে এটা-সেটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা। রানার মন খুঁতখুঁত করছে কেন যেন। কোথায় কী যেন একটা অসামঞ্জস্য আছে, ধরতে পারছে না ও। কোথায়? কী? একটু পর দেখা গেল একা তাবাস্‌সুমই কথা বলছে, অন্যরা শ্রোতা। যে-সব বিষয়ে কথা বলছে মেয়েটা, এই পরিবেশে তা একেবারেই অর্থহীন। এমনকি তার আচরণও বেমানান, বেখাপ্পা।

অস্বস্তিতে পড়ে গেল রানা। ও যে কিছু সন্দেহ করছে গায়িকার ব্যাপারে, তমিজউদ্দিন তা টের পেয়ে গেছে, বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না। প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে লোকটা। বিব্রতকর।

সীনে এক যুগল উপস্থিত হতে পরিস্থিতি বদলে গেল। তখনই মন খুঁতখুঁত করার কারণটা ধরতে পারল ও। আর সব টেবিলে চারটে করে চেয়ার থাকলেও এটায় আছে ছয়টা। তার দুটো খালি ছিল এতক্ষণ। এঁদের জন্যে নিশ্চয়ই।

নতুন আসা পুরুষটিকে দেখতে পেয়ে তমিজউদ্দিনের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখল রানা। যদিও মনের ভাব সযত্নে চেপে রাখল সে। মেয়েটা ছোটখাট, রোগা স্বাস্থ্যের। সঙ্গী বেশ হ্যান্ডসাম। চেহারা-সুরতে মিশরীয় বলেই মনে হলো। মনের মধ্যে সতর্ক ঘণ্টা বেজে উঠল ওর—পরিচিত মনে হচ্ছে না লোকটাকে? ভাবল রানা, কে ও? কে? কে? কে?

ভুলেও ভাবেনি ওর মত নবাগত লোকটিও একই কথা ভাবছে। তারও চেনা-চেনা লাগছে রানাকে। মনে মনে স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়াচ্ছে সে-ও। যদিও চেহারায় তার কোন লক্ষণ নেই।

'ব্রুনো, এ হচ্ছে আমার আরেক বান্ধবী,' তাবাস্‌সুম ওদেরকে পরিচয় করিয়ে দিল। 'ফারদিন উমার। আর এ ওর স্বামী

ইসমাইল উমার। আর ইনি ক্রুনো ডিয়েট্রিচ।'

'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস্টার ক্রুনো ডিয়েট্রিচ,' বলল ইসমাইল। নজর রানার ওপর সেঁটে রয়েছে, মুখে দুর্বোধ্য হাসি। রানাও কিছু বলল জবাবে, কিন্তু কী যে বলল, নিজের কাছেও স্পষ্ট হলো না। ডক ছেড়ে পিছাতে শুরু করল স্টেলা সোলারিস, একটুপর ঘুরে ভূমধ্যসাগরে এসে পড়ল।

ফারদিনের ডান হাতে একটা রুমাল পেঁচানো দেখতে পেল রানা। কারণটা বুঝতে পারল না। তাকে নিয়ে খুব একটা মাথাও ঘামাচ্ছে না ও, ইসমাইলের কথা ভাবছে। এখন পুরোপুরি নিশ্চিত, কোথাও না কোথাও লোকটাকে দেখেছে ও। অথবা ছবি দেখেছে তার।

পান আর গল্প চলছে। বিশ্ব রাজনীতি, পরিবেশ দূষণ, ওজোন স্তর, কিছুই বাদ যাচ্ছে না। সন্ধের প্রায় সাথে সাথেই শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখা দিল মাঝ-আকাশে। তার ফ্যাকাসে আলোয় সাগরের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলো সবাই, কিন্তু রানার মন জুড়ে বিরাজ করছে ইসমাইল উমার! অথচ কিছুতেই ধাঁধার জবাব মিলছে না। ডিনারের ঘণ্টা পড়তে ছেদ পড়ল আড্ডায়।

দু'হাতে বান্ধবী ও তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরে আগে আগে ডাইনিং হলের দিকে চলল গায়িকা। মাথাটা কাত হয়ে আছে ইসমাইলের দিকে, যেন কিছু বলছে তাকে লোকটা। ওদের পিছনে রয়েছে তমিজউদ্দিন, রানা ও সায়মা পিছনে। এতক্ষণে একা হওয়ার সুযোগ পেয়ে কিছুটা স্বস্তি পেল যেন মেয়েটা। বাঁকা চোখে রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নীলকে বেশ ভালই প্রভাবিত করেছ তুমি।'

'তাই নাকি?' রানা মাথা নাড়ল। 'কই, আমার তো তা মনে হলো না। এরা দু'জন কারা?'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সায়মা। 'আমি ভালমত চিনি না

ওদেরকে। মেয়েটা শুনেছি প্যারিসের এক হোটেলে গান গায়। প্রথমবার ওর গান শুনে নীল খুব খুশি হয়েছিল। প্রায়ই বলে মেয়েটার নাকি প্রতিভা আছে।'

'তা এখানে কেন ওরা?'

শ্রাগ করল সে। 'জানি না। তবে গতকাল একদম শেষ মুহূর্তে ওদের জন্যে স্যুইট রিজার্ভ করতে গিয়ে জান বেরিয়ে গেছে আমার।'

'ওদের রিজার্ভেশনও তোমাকে করতে হয়েছে?' রানা বলল।

'হ্যাঁ, একেবারে শেষ মুহূর্তে। নীল বলল, কী আর করা!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। 'লোকটা কী করে?'

'জানি না। কেন?' ঘুরে তাকাল সায়মা।

'না, এমনিই।' রানা অন্যমনস্ক। 'ওদের ভিসাও তোমাকে জোগাড় করতে হয়েছে নাকি?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'নাহ্।'

যাত্রা শুরুর পর প্রথম ডিনার, কাজেই বেশ শানদার হলো আয়োজন। তবে খিদে থাকলেও খেতে পারল না রানা। ওর মাথায় ঘুরছে ইসমাইল-ফারদিন। কেন শেষ মুহূর্তে ওদের জন্যে জাহাজের স্যুইট রিজার্ভ করতে হলো? দু'দিন আগে ওরা যখন নিজেদের স্যুইট রিজার্ভ করে, এদেরটাও তখনই কেন করা হয়নি? এদের আসার ঠিক ছিল না? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, আগে থেকে বুক করা না থাকলে সান লাইন কোম্পানির জাহাজের টিকেট সংগ্রহ করতে পারা অসম্ভব এক কাজ।

সায়মার কথায় বোঝা গেছে সেরকম কোন ব্যবস্থা ছিল না এই যুগলের জন্যে। তাহলে কাজটা সম্ভব হলো কী করে? নিশ্চয়ই প্রভাবশালী কারও চাপে আর কারও রিজার্ভেশন বাতিল করতে হয়েছে সান লাইনকে। সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়ার মত এ ধরনের কাজ সাধারণত কেউ করে না। অথচ মনে হচ্ছে সান লাইনকে তাই

করতে হয়েছে। কার চাপে?

ডিনার শেষ হতে উঠে পড়ল রানা, সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে স্যুইটে ফিরে এল। ঠিক মাঝরাতে নক হলো দরজায়। ও ভেবেছিল সায়মা, কিন্তু দেখা গেল তাবাস্‌সুম। হাসছে। 'ভেতরে আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই!'

নিজেই দরজা বন্ধ করল মেয়েটা, এগিয়ে এসে সোফায় বসল আধশোয়া হয়ে। দৃষ্টি অন্তর্ভেদী, অথচ মুখে মধুর হাসি।

'ড্রিঙ্ক?' রানা বলল।

'যদি স্কচ থাকে,' কুশনে ভর দিয়ে প্রায় শুয়েই পড়ল গায়িকা। ভঙ্গিটা আমন্ত্রণের। না দেখার ভান করে মিনি বারে এসে স্কচ ঢালল রানা, গ্লাসটা ধরিয়ে দিয়ে কাছের এক সিঙ্গল সোফায় বসতে যাচ্ছিল। কিন্তু খপ্‌ করে ওর হাত ধরে ফেলল মেয়েটা।

'দূরে কেন? কাছেই বোসো না! সায়মার মুখে তোমার পেশার কথা শুনেছি আমি।' এক ঢোক গিলল তাবাস্‌সুম। 'সবার সামনে তো ওসব নিয়ে কথা বলা যায় না, তাই...সত্যি তুমি আর্মস বিক্রি করো, ব্রুনো? দারুণ এক্সাইটিং পেশা, না?'

'করি,' বলে মুখ বিকৃত করল ও। 'কিন্তু কাজটার মধ্যে এক্সাইটমেন্টের কিছু নেই।'

'ননসেন্স!' শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাস রেখে দিল তাবাস্‌সুম। 'নেই বললেই হলো? সায়মা বলেছে, অনেকদিন থেকে আমাদের প্যালেস্টাইনী ভাইদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করছ তুমি। বলো, ব্রুনো! তোমার সব কথা শুনব বলেই না এত রাতে চুপি চুপি এলাম। বলো, আমার জানা দরকার।'

'কেন?'

'সেটা পরে শুনো। আগে বলো তো!'

কাল্পনিক ব্রুনো ডিয়েট্রিচের মুখস্থ করে আসা ডোশিয়ে থেকে একটু একটু করে বলে যেতে লাগল ও। মেয়েটা মন দিয়ে শুনছে, থেকে থেকে এটা-সেটা প্রশ্ন করছে। হঠাৎ রানার খেয়াল হলো, ওকে সন্দেহ করা হচ্ছে না তো? বাজিয়ে দেখতে এসেছে গায়িকা?

এরমধ্যে এগিয়ে আসতে আসতে ওর প্রায় কোলে চড়ে বসার জোগাড় করেছে তাবাস্সুম। তার চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করল ও, বুঝল না কিছুই। হঠাৎ উঁচু হলো সে, রানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সশব্দে চুমু খেল ওর থুতনির পাশে। 'ব্রুনো, তুমি জানো তুমি কত আকর্ষণীয় পুরুষ?'

'ধন্যবাদ, কিন্তু...'

'ভয় পাচ্ছ কেন?'

'ভয়!' বোকার মত হেসে উঠল ও। 'কই? না তো!'

'তাহলে সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছ না কী জন্যে?'

'না, কাঁধের ব্যথাটা আবার বেড়েছে তো। তাই...সরি, নীল। অন্য একদিন, কেমন?'

চেহারায় একযোগে হতাশা আর বিরক্তি ফুটল ওর। 'তুমি আমার ডাক নাম জানলে কী করে?'

'সায়মার মুখে। ও তো তোমাকে ওই নামেই ডাকে।'

'ও।' চেহারা আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো গায়িকার। 'তা তোমার এবারের মিশর সফরের কারণ কি, অস্ত্র বিক্রি?'

শ্রাগ করল ও। 'বলা যাবে না,' হাসল। 'টপ সিক্রেট।'

'বুঝেছি। ওকে, লেডিকিলার, আজ যাচ্ছি আমি। কিন্তু আবার আসব, মনে রেখো।' উঠে দাঁড়াল সে, গাউন টেনেটুনে ঠিক করে এগোল দরজার দিকে। 'গুড নাইট।'

আলো নিভিয়ে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করল রানা, তারপর নিঃশব্দে উঁকি দিল বাইরে। কেউ নেই, করিডর আর ফোরডেক

একদম ফাঁকা। বাতাস আসছে হু-হু করে। চাঁদ ডুবে গেছে অনেক আগেই। দশ গজ পর পর ডিম লাইট জ্বলছে করিডরের সিলিঙে, হলদেটে আলো ছড়াচ্ছে ওগুলো। আধো আলো আধো ছায়া পরিবেশ।

সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো রানা, চারদিকে সতর্ক নজর রেখে নিঃশব্দ পায়ে, দ্রুত এগোল উল্টোদিকের একসার স্যুইটের উদ্দেশে। দু'মিনিট পর সায়মার দরজায় নক্ করল ও, খুব আস্তে। দু'বার নক্ করতে খুলে গেল দরজা, সামনেই রানাকে দেখতে পেয়ে রীতিমত আঁতকে উঠল মেয়েটা, হাত ধরে টেনে ভেতরে ঢোকাল ওকে। দ্রুত বাইরে চোখ বুলিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুরে তাকাল।

'তুমি? এতরাতে?'

'ঘুম আসছিল না,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল রানা। 'তাই ডেকে হাঁটাহাঁটি করতে বেরিয়েছিলাম। দেখি, আলো জ্বলছে তোমার এখানে। এত রাতে জেগে কী করছ তাই দেখতে এলাম।'

'তোমার গালে লিপস্টিক লেগে রয়েছে,' একটু গম্ভীর গলায় বলল সে।

'দুঃখিত। তোমার বান্ধবী...'

'আমি জানি। দেখেছি। কেন গিয়েছিল ও?'

'অ্যাকচুয়ালি, আমাকে রেপ করতে।'

গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়ল সায়মার, একটু একটু করে হাসি ফুটল মুখে। সেই সাথে রাঙা হয়ে উঠল দু'গাল। 'কী?'

'সত্যি বলছি। কিন্তু তুমি ওকে দেখলে কী করে?' বলল রানা। খেয়াল করল, এখনও সন্ধের পোশাক ছাড়েনি মেয়েটা।

মুখ নামিয়ে নিল সায়মা। 'আমারও ঘুম আসছিল না। ভেবেছিলাম তোমার সাথে একটু গল্প করে আসি। ক্রুনো, আসলে কেন গিয়েছিল ও?'

'ওই যে বললাম। সেই সাথে আমার জীবন-কাহিনী শোনার আগ্রহও ছিল অবশ্য।' সোফায় বসল ও। এক কোণে রাখা রীডিং টেবিলের ওপর টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, কিছু খোলা কাগজপত্র রয়েছে আলোর নিচে। 'কী লেখাপড়া করছ এত রাতে?'

'ইজিপশিয়ান কাস্টমসের জন্যে কাগজপত্র তৈরি করে রাখছি। একদিন পর তো করতেই হবে। কিন্তু তোমার ঘুম না আসার কারণ কি, দুশ্চিন্তা?'

হেসে উঠল ও। 'পুলিসের কথা মীন করছ? নাহ্, পুলিস নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই আমার, অন্তত এই অঞ্চলের পুলিস বিভাগ নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি।'

'তাহলে?' বলেই সামলে নিল সায়মা। 'সরি, প্রশ্নটা নিতান্তই ব্যক্তিগত হয়ে গেল বোধহয়।'

'তা একটু হয়েছে,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি সে জন্যে কিছু মনে করিনি। তবে উত্তর শুনলে তুমি না মাইন্ড করে বসো।'

'আমি মাইন্ড করব?' ভুরু কোঁচকাল সায়মা। মাথা নাড়ল। 'করব না। বলো।'

'উঁহুঁ! করবে।'

হেসে ফেলল সে। 'বলছি তো করব না। বলো।'

'প্রমিজ?'

'আরে, কী এমন কথা? আচ্ছা, প্রমিজ।'

'তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল,' ওর চোখে চোখ রেখে নির্বিকার চিত্তে গুলটা মেরে দিল রানা। 'তাই চলে এলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল সায়মার। ওর ভেতরের উচ্ছ্বাসের জোয়ার শুরু হয়ে গেছে স্পষ্ট টের পেল রানা। মনে মনে জিভ কাটল, ফাউল হয়ে গেছে। কথাটা যেভাবে বলবে ভেবেছিল, সেভাবে বলা হয়নি।

'কেন?' উচ্ছ্বাস চাপা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টার ফাঁকে প্রায় ফিস্‌ফিস্

করে জানতে চাইল মেয়েটা।

'কী জানি,' শ্রাগ করল রানা। 'মন জানে হয়তো।' ঠাস্ করে এক চড় মারতে ইচ্ছে হলো নিজের গালে। এবারও ফাউল হয়ে গেল। কিন্তু…সত্যিই ফাউল? ভাবল রানা। নাকি সত্যি…

'মনকে জিজ্ঞেস করোনি?' মিটিমিটি হাসছে সায়মা। ওর বিব্রত চেহারা দেখে মজা পেয়ে গেছে যেন।

মাথা নাড়ল ও। 'দেখি, আজ রাতে জিজ্ঞেস করব। চলি এখন,' বলে টেবিলের কাগজপত্র দেখাল। 'তোমাকে ডিস্টার্ব করে গেলাম…'

হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে ফেলল সায়মা। 'যেয়ো না,' বলে মুখ নামিয়ে নিল লজ্জায়। 'আরেকটু থাকো।'

কথাগুলোর মধ্যে এমন কিছু ছিল, শুনে চমকেই উঠল রানা। ওর চাউনি দেখেই বুঝল, প্রকৃতির অমোঘ ফাঁদে আগে থেকেই পা দিয়ে বসে আছে বোকা মেয়েটা। প্রেমে পড়ে গেছে রানার। মন খারাপ হয়ে গেল। এ জন্যে নিজেকে দায়ী করল ও। কর্তব্য পালনের ছলে আলো হয়ে মেয়েটিকে পতঙ্গের মত আকৃষ্ট করেছে ও নিজের দিকে।

নিজেকে চোখ রাঙাল। কী হচ্ছে এসব? অনুরাগে গলে গেলে নাকি? সায়মার মাথার ওপর দিয়ে টেবিলের দিকে তাকাল। উমার দম্পতির কাগজপত্র আছে নিশ্চয়ই ওর মধ্যে?

চোখ নামিয়ে মেয়েটাকে দেখল। এখনও ওর হাত ছাড়েনি। 'রাত অনেক হলো,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'হোক না,' চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নিল সায়মা। দু'গালে লালচে আভা ফুটল। একটা হাত রাখল রানা মেয়েটার কাঁধে। ওর মুখটা উঁচু করে ধরল। চোখ মুদে আছে সায়মা, পাতা কাঁপছে তিরতির করে। মৃদু ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট। 'সায়মা,' আবেগ ফুটল ওর গলায়। 'আমাকে নিয়ে যদি কোন স্বপ্ন দেখো, শুরুতেই

ভেঙে যাবে। কষ্ট পাবে তুমি।'

চোখ মেলল মেয়েটা, সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখল। কিছু খুঁজছে যেন। 'গেলে যাবে। মধুর একটা স্মৃতি তো থাকবে।' মন পাগল করা হাসি ফুটল মুখে। 'মেয়ে হয়ে তো জন্মাওনি, কী করে বুঝবে কীসে তাদের আনন্দ, কীসে কষ্ট?'

দ্বিধা দূর হয়ে গেল রানার।

এক ঘণ্টা পর, গায়ের ওপর থেকে সায়মার হাতটা খুব সাবধানে নামিয়ে দিল ও। কিছু সময় অনড় থেকে মেয়েটাকে লক্ষ করল—নাহ্, ঘুম ভাঙেনি। আগের মতই গভীর নিঃশ্বাস পড়ছে। কাত হয়ে ঘুমাচ্ছে ও, নীলচে ডিম লাইটের আলোয় সাদা বালিশে ছড়িয়ে থাকা ওর রেশমী চুলের গোছার মধ্যে সুন্দর মুখটা যেন ফুলের মত ফুটে আছে। অপূর্ব লাগছে দেখতে।

খুব সাবধানে বেড থেকে নেমে পড়ল রানা, ওর ওপর চোখ রেখে তৈরি হয়ে নিল। তারপর পা টিপে এগোল রাইটিং টেবিলটার দিকে, হাতে বেরিয়ে এসেছে পেন্সিল টর্চটা। টেবিলের ওপর ছড়িয়ে থাকা খোলামেলা কাগজপত্রের ওপর দ্রুত চোখ বুলাতে লাগল রানা। ওসবের মধ্যে ইসমাইল ও ফারদিনের পাসপোর্ট, ভিসার আবেদনপত্র ইত্যাদি দেখে নিঃশব্দে শিস বাজাল ঠোঁট গোল করে।

মাত্র দু'দিন আগে প্যারিসের মিশরীয় দূতাবাস উমার দম্পতির ভিসা ইস্যু করেছে। এবং এক মাস আগে নয়, মাত্র এক সপ্তাহ আগে বিয়ে হয়েছে তাদের, ফলে নতুন পাসপোর্ট তৈরি করা যায়নি ফারদিনের। ভিসা ইস্যু হয়েছে পুরানো পাসপোর্টের ওপর। কিন্তু সেসব নয়, রানার বিস্ময়ের কারণ হচ্ছে আরেকটা বিষয়: এই দম্পতির ভিসা ইস্যুর ক্ষেত্রে দূতাবাসের সর্বকালের রেকর্ড ভাঙার ব্যাপারটা।

আবেদন পেশ করার এক ঘণ্টার মধ্যে ইস্যু হয়েছে তাদের ভিসা। অদ্ভুত কাণ্ড! যে কাজে অন্তত পক্ষে তিনদিন লাগার কথা, সে কাজ মাত্র এক ঘণ্টায় হয়ে গেল কোন অলৌকিক ক্ষমতাবলে? এ ব্যাপারে অবশ্যই মিশরের প্রভাবশালী কেউ একজন কলকাঠি নেড়েছে–কে সে? ভাবল রানা। কায়রো বা এথেন্সের বিসিআই অফিস এ ব্যাপারে কিছু টের পেল না, তাই বা কেমন করে সম্ভব হলো?

এতই মগ্ন ও চিন্তায়, কখন যে সায়মার ঘুম ভেঙে গেছে, টেরই পায়নি। পিছন থেকে অপলক ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, বিস্ময়ে কুঁচকে আছে ভুরু।

সাত

পরদিন সকাল দশটায় গ্রীক রোডস দ্বীপে নোঙর করল স্টেলা সোলারিস। পুরো সাত ঘণ্টার বিরতি। এত লম্বা সময়ের বেশিরভাগটাই তীরে কাটায় যাত্রীরা। কেনাকাটা করে, ঘুরে বেড়ায়, ছবি তোলে, দর্শনীয় স্থান দেখতে যায়, এমনকি পিকনিকও করে। জাহাজ প্রায় খালিই থাকে তখন।

গ্যাঙওয়ে পাতা হতে দল বেঁধে নামতে শুরু করল যাত্রীরা। রানাও গা ভাসিয়ে দিল ভিড়ের সাথে। তীরে এসে বেশ কিছু সময় ঘুরঘুর করল তমিজউদ্দিনের দলের কেউ নামে কী না দেখার জন্যে। নামল না। নিশ্চিন্ত মনে একটা ট্যাক্সি ক্যাবে উঠে বসল ও।

'লিন্ডোস চলো।'

'লিন্ডোস?' অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল ড্রাইভার। 'পথ তো অল্প। হেঁটে গেলে পাঁচ মিনিটও লাগবে না।'

'জানি,' বলল ও। 'কিন্তু আমি মানুষটা অলস। তাছাড়া ইনল্যান্ড রোড দিয়ে ওখানে যেতে চাই।'

'ডবল ভাড়া লাগবে তাহলে।'

'শুধু অলসই নই আমি, ধনীও।'

পথের দুধারে গোলাপ ফুলের বাগান দেখতে দেখতে চলল রানা। যেদিকেই চোখ যায়, শুধু গোলাপের বাগান এই দ্বীপে। তাই এর আরেক নাম আইল্যান্ড অভ রোজেস। কত রঙের যে বাহারি গোলাপ, গুনে শেষ করা যায় না। নয়ন-মন জুড়িয়ে যায় দেখলে। আরও এক কারণে বিখ্যাত এই দ্বীপ। গ্রীক পুরাণের সূর্য দেবতা অ্যাপোলোর জন্মস্থান এটা।

লিন্ডোসের অ্যাক্রোপোলিসে ক্যাব থামাতে বলল রানা। 'অপেক্ষা করো। আমি আসছি।'

'অপেক্ষা করব?' খেপে উঠল ড্রাইভার, 'এই বিজি আওয়ারে? পাগল হয়েছেন নাকি?'

'বিজি আওয়ার বলেই তো ছাড়তে চাই না তোমাকে,' নেমে পড়ল ও। আমেরিকান একশো ডলারের একটা নোট গুঁজে দিল লোকটার হাতে। 'ওয়েট।'

ওটায় সশব্দে চুমু খেয়ে হাসল লোকটা দাঁত বের করে। 'শিওর থিং, সার। এখন অলিম্পাস থেকে সমস্ত দেবতা নেমে এসে তাড়া করলেও নড়ছি না আমি। হ্যাভ আ নাইস ডে, সার।'

পা চালাল রানা। শহরের পুরানো, ঘিঞ্জি এলাকা এটা। তবে যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রংচটা দালান নেই একটাও, সব চুনকাম করা। রাস্তাগুলো সরু, মানুষের চাপে হাঁটা দায়। সম্ভাব্য ফেউ খসানোর জন্যে মিনিট বিশেক নানান কসরৎ করল ও,

তারপর সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল এক গলিতে। খুব বেশি হলে ছয় ফুট চওড়া ওটা। দু'দিকের উঁচু-উঁচু ভবন সূর্যের আলো আসার পথ রাখেনি বলে প্রায় অন্ধকার। ভেতরে ঢুকলে দম আটকে আসে।

নির্দিষ্ট ভবনটা খুঁজে বের করল রানা। আটতলা ওটা, প্রতি ফ্লোরে ছোট-ছোট অসংখ্য অফিস। দেখতে লিফটের মত একটা তিন ফুট বাই তিন ফুট খাঁচা আছে। ওটার কাজও লিফটের মতই। এক বৃদ্ধ চালায়, সব সময় চোখ ভর্তি পানি থাকে তার। হঠাৎ দেখলে মনে হয় কাঁদছে বুঝি সারাক্ষণ।

'ছয়তলায় আমদানী-রফতানীকারক জালাল সাহেবের অফিসে যেতে চাই,' বলল রানা। 'উনি এসেছেন?'

ঘুম-ঘুম ভঙ্গিতে মাথা দোলাল বৃদ্ধ। ও শঙ্কিত পায়ে ভেতরে এসে দাঁড়াতে খাঁচার আউটার ওয়ায়্যার গেট টেনে দিল। বাড়তি কয়েক ইঞ্চি জায়গা পাওয়া যাবে বলে ইনারটা লাগাল না। দোল খেতে খেতে ওপরের দিকে যাত্রা শুরু করল লিফট।

'সহি সালামতে পৌঁছতে পারব তো?' ভয়ে ভয়ে বলল ও।

জবাব দিল না বৃদ্ধ। ঘোলাটে দৃষ্টিতে আরও ঘোলা ইন্ডিকেটরের দিকে তাকিয়ে আছে। ছয়তলায় নিরাপদেই পৌঁছল খাঁচা করিডরে বেরিয়ে এলো রানা হাঁপ ছেড়ে। দুদিকে চোদ্দ-পনেরো ফুট করে দীর্ঘ করিডর, তার দু'পাশে দুটো করে মোট আটটা দরজা। বাঁ দিকের শেষ মাথার ডানের বন্ধ দরজায় নক্ করে ঢুকে পড়ল ও।

জালাল আহমেদ ছোটখাট মানুষ, বয়স পঁয়তাল্লিশের মত। মাথাজোড়া চকচকে টাক। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। স্থানীয় বিসিআই এজেন্ট লোকটা। 'ইয়েস?' ওকে দেখে গ্রীক ভাষায় বলল সে। 'আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

'বলছি,' খাস বাংলায় বলল রানা। 'একটু সুস্থ হতে দিন। যে

লিফট আপনাদের, এখনও বুক কাঁপছে আমার।'

চট্ করে উঠে দাঁড়াল জালাল আহমেদ, চশমার পিছনে ক্রমে বড় হচ্ছে চোখ দুটো। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসুন! প্লীজ!'

বসল ও। চারদিকে নজর বোলাল। রুমটা আয়তাকার, সাত বাই দশের মত হবে। ভেতরে দুটো ডেস্ক, একটা এ মুহূর্তে খালি। অন্যটা জালাল আহমেদের। এছাড়া ছয়টা চেয়ার, একটা ফাইলিং কেবিনেট ও একটা টাইপ রাইটার, এই হচ্ছে অফিসের আসবাবপত্র। আর আছে দুটো টেলিফোন।

দু'মিনিট পর নিজের পরিচয় ঘোষণা করল ও। আনন্দে দাঁত বেরিয়ে পড়ল জালাল আহমেদের। 'ওফ্, কত বছর পর হেড অফিসের একজনকে পেলাম!' বলল সে। 'আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম! বলুন, কী খাবেন।'

'পরে। ঢাকার কোন মেসেজ আছে?'

ডেস্কের ড্রয়ার থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল জালাল, এগিয়ে দিল ওর দিকে। 'আপনার আলেকজান্দ্রিয়ার প্লেস অভ কন্ট্যাক্ট, এবং সময়।'

ওটায় চোখ বুলিয়ে তথ্যগুলো মুখস্থ করে নিল রানা, লাইটার জ্বেলে এক কোনায় আগুন ধরিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল টুকরোটা। 'কখন এসেছে এটা?' মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে গেল মেসেজ।

'ভোর তিনটার দিকে।'

উঠে রুমের একমাত্র জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। নিচের গলি, মেইন রোড এবং দূরের সাগর, সব দেখা যায় এখান থেকে। গতরাতে ওর কেবিন স্যুইটে তাবাসসুমের আসার কথা খেয়াল হলো হঠাৎ। আসলে কেন এসেছিল মেয়েটা? ভাবল, ওর বর্মতে কোন ফুটো আছে কিনা পরখ করে দেখতে? তমিজউদ্দিন পাঠিয়েছিল?

'ঢাকায় একটা কোয়্যারি পাঠাতে হবে! আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছেই জবাবটা চাই।'

'শিওর!' কলম ও রাইটিং প্যাড নিয়ে তৈরি হলো জালাল। 'বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি।'

'ইসমাইল উমার এবং ফারদিন উমার, ইদানীং বিয়ে করেছে। দু'জনেই মিশরীয়, তবে ফরাসী পাসপোর্টধারী। মেয়েটি প্যারিসের এক নাইট ক্লাব-সিঙ্গার। মিশর সরকার তিনদিন আগে ভিসা দিয়েছে এদের দু'জনকে। অ্যাপ্লাই করার মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ইস্যু করা হয়েছে ভিসা। কায়রোয় ওদের হয়ে কে কাজ করেছে জানতে হবে।

দু'জনের দৈহিক বর্ণনাও দিল ও

লাঞ্চ আওয়ারের পর জাহাজে ফিরল রানা। লেট লাঞ্চ করতে ডাইনিং সেলুনে যাওয়ার আগে গলা ভেজাবার জন্যে বারে এল। এন্ট্রান্সের কাছে একা বসে ছিল ইসমাইল উমার, রানার 'হ্যালো'র জবাবে সামান্য মাথা দোলাল, তারপর আচমকা জিজ্ঞেস করে বসল, 'আচ্ছা, মিস্টার ডিয়েট্রিচ, আপনি কি কখনও বাংলাদেশে গিয়েছিলেন? ব্যবসার কাজে বা...'

'কই, না তো?' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন বলুন তো? আপনি গিয়েছিলেন?'

মাথা নাড়ল উমার, তারপর উঠে চলে গেল বিদায় না নিয়েই।

হারামজাদা আচ্ছা অভদ্র তো!—ভাবল রানা।

লাঞ্চ সেরে এক কপি ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন নিয়ে সুইমিং পুলের কাছে লিডো ডেকে এসে বসল। বেশিরভাগ যাত্রী নেমে যাওয়ার পরও যারা রয়ে গেছে, তাদের সংখ্যাও কম নয়। পুলের চারদিকে সূর্য স্নানার্থী মেয়ে রয়েছে প্রচুর। কেউ কেউ চোখ তুলে দেখল রানাকে, মিষ্টি হাসিও উপহার দিল দুয়েকজন।

তাদের হাসি ফিরিয়ে দিয়ে লাউঞ্জে বসল ও, পত্রিকায় চোখ বোলাতে লাগল। মিনিট দুই পর মন ছুটে গেল ওটায় কারও মাথার ছায়ায় পড়তে। মুখ তুলল রানা। নিজের প্রায় সমবয়সী এক যুবককে দেখতে পেল। চমৎকার ছাঁটের টুইড ও ফেয টুপি পরা। চোখ দুটো উজ্জ্বল তার, তীক্ষ্ণ চাউনি। হাতে একটা ক্লিপবোর্ড। চোখাচোখি হতে মিষ্টি হাসি ফুটল লোকটার মুখে।

'হের ব্রুনো ডিয়েট্রিচ?' বলল সে।

'জা।'

'আমি ওমর আজিজ, ইজিপশিয়ান ট্যুরিস্ট অথরিটি থেকে। আপত্তি না থাকলে কিছু প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।'

'নিশ্চয়ই!' পত্রিকা ভাঁজ করল রানা। 'বসুন।'

'ধন্যবাদ,' ওর মুখোমুখি বসল ওমর আজিজ। ক্লিপবোর্ডটা কোলের ওপর রেখে ওটার সাথে আঁটা কাগজপত্র ওল্টাতে লাগল। মুখে হাসি। 'রুটিন জব, বুঝতে পারছেন নিশ্চই?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ওর দাঁতও যে ঝকঝকে এবং মজবুত, দেখিয়ে দিল। 'ডোন্ট বদার। কী জানতে চান, বলুন।'

'আপনি আলেকজান্দ্রিয়া যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কায়রো সফরের উদ্দেশ্য?'

শ্রাগ করল ও। 'সান, ফান, পিরামিড, স্ফিংস।'

চাউনি এবং হাসি, দুটোই দ্ব্যর্থবোধক হয়ে উঠল ওমর আজিজের। 'ইওর হেলথ, সার।'

'পারহ্যাপস।'

'কায়রোয় কতদিন থাকবেন?'

'দু'চারদিন,' বলল রানা। 'হয়তো।'

অনুসন্ধানী চোখে রানাকে পর্যবেক্ষণ করল লোকটা। 'একটা সোজা কথা বলতে চাই, হের ডিয়েট্রিচ।'

'প্লীজ।'

ওর পিছনে কাউকে দেখল আজিজ চোখ কুঁচকে। গলা নামাল। 'আপনার পেশা সম্পর্কে ইন্টারপোলের হাতে বেশ পুরু একটা ডোশিয়ে আছে।'

'তাই নাকি?' বলল রানা।

'সে আপনি ভালই জানেন, সার,' একটু কঠোর গলায় বলল সে। 'আমরা খুশি হব যদি আপনি কায়রোয় ওই লাইনের কারও সাথে যোগাযোগ বা অন্য কোন ধরনের তৎপরতা চালানো থেকে বিরত থাকেন।'

'কথাটা মনে থাকবে আমার।'

উঠে পড়ল ওমর আজিজ। 'সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। আপনার কায়রো ভ্রমণ উপভোগ্য হোক।'

লোকটা চলে যেতে পত্রিকা খুলল রানা। ওর কয়েক হাত পিছনে উপুড় হয়ে সানবাথ করছিল ফারদিন, আজিজ চলে যেতে উঠে দাঁড়াল সে। দ্রুত পায়ে নিজেদের স্যুইটের দিকে চলল। কিছুই টের পেল না রানা, ও ভাবছে আজিজের কথা। মিশর সরকার কী জানে না ব্রুনো ডিয়েট্রিচ ভুয়া? এই নামে কেউ নেই? থাকলেও সে অন্তত অস্ত্র ব্যবসায়ী নয়? তাহলে এই ইন্টারভিউর অর্থ কী? এতসব অর্থহীন কথা কেন খরচ করে গেল লোকটা?

হঠাৎ একজোড়া কাঁচাপাকা ভুরুর ছবি ভেসে উঠল ওর মনের পর্দায়। এসব ওই বুড়োর কাজ নয়তো? ভাবল মাসুদ রানা। ওর পরিচয় 'প্রতিষ্ঠিত' করার জন্যে এই নাটকের আয়োজন করেনি তো বুড়ো? যদি তাই হয়, শ্রাগ করল ও মনে মনে, ফ্লপ করেছে নাটক। দর্শক-শ্রোতা ছাড়া নাটক আবার নাটক নাকি?

বিকেল ঠিক পাঁচটায় রোডস আইল্যান্ড ছাড়ল স্টেলা সোলারিস। এবার সোজা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া। পাক্কা

পঁচিশ ঘণ্টার যাত্রা। পরদিন সন্ধে ছ'টায় শেষ হবে।

যাত্রা শুরুর ঠিক এক ঘণ্টা পর রানার স্যুইটে এলো সায়মা। রানাও মনে মনে ওকেই আশা করছিল, কেন না ওরা আলেকজান্দ্রিয়ায় কী করবে, কোথায় যাবে, ইত্যাদি জানতে হবে ওর।

'সারাদিন কোথায় ছিলে?' ঢুকেই প্রশ্ন করল সায়মা।

'দ্বীপটা ঘুরে দেখতে গিয়েছিলাম,' হাসল রানা। 'সারাদিন কোথায়, ঘণ্টা তিনেক নিচে ছিলাম। বোসো।'

কাউচের এক মাথায় পায়ের ওপর পা তুলে বসল ও। সাদা ট্রাউজার্স ও টকটকে লাল টি-শার্ট পরেছে আজ। কানে ছোট ছোট মুক্তো বসানো দুল, কব্জিতে ব্রেসলেটের জায়গায় সোনার হাতঘড়ি। এলোচুল। এতেই অসাধারণ লাগছে মেয়েটিকে। রানাকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখে মুচকি একটু হাসল। 'কী দেখছ?'

'বলব না,' রানা বলল। 'দেমাগ বেড়ে যাবে তোমার।'

হেসে উঠল সায়মা।

'তোমার বান্ধবী কোথায়?'

'কেবিনে। ডিনারের জন্যে তৈরি হচ্ছে। ব্রুনো, কালকের পর বোধহয় আমাদের আর দেখা হচ্ছে না?'

'কেন?'

'একদিন আলেকজান্দ্রিয়ায় থেকে কায়রো চলে যাব আমরা,' সায়মা বলল। 'তুমি কী করবে?'

'আমিও তো তাই করব ভেবে রেখেছি,' ও বলল। 'মামুরা প্যালেসে এক রাত কাটিয়ে পরদিন...'

'মামুরা প্যালেস!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। 'আমরাও তো ওই হোটেলেই উঠব! কী আশ্চর্য!'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, যেন

বিস্ময় হজম করতে পারছে না। 'তারপর? পরদিন নিশ্চই ট্রেনে...'

মাথা নাড়ল সায়মা। 'না। নীলের গাড়ি আসবে আমাদের নিয়ে যেতে। ওটায় করে আমরা পাঁচজন চলে যাব।'

'ও,' রানা বলল। 'আমি যাচ্ছি ট্রেনে। যাক্, অন্তত একটা ব্যাপারে আমাদের প্ল্যানিঙ মিলল না, কি বলো?'

'ওখানে ক'দিন থাকবে?'

মাথা নাড়ল ও। 'ঠিক নেই। দুই-তিনদিন।'

'কোথায় উঠবে?' বলল সায়মা।

'এখনও ঠিক করিনি,' রানা বলল। 'তোমরা?'

'নীলের বাংলোয়। অবশ্য উমার দম্পতি শেফার্ড্'স হোটেলে উঠবে। তুমি চাইলে ওটাতে উঠতে পারো। তাহলে তোমার সাথে দেখা করা সহজ হবে আমার জন্যে। সন্ধের পরে অবশ্য।'

'নীল বাধা দেবে না?'

মাথা নাড়ল সায়মা। 'কায়রোয় থাকলে সন্ধের পর আমি ফ্রী থাকি। তাছাড়া ও এখন নিজেই ব্যস্ত থাকবে কিছুদিন।'

ইঙ্গিতটার অর্থ বুঝল রানা। 'এই তমিজউদ্দিন লোকটার সঙ্গে কতদিনের পরিচয় নীলের?'

'তিন-চার বছরের।'

'কী করে লোকটা?'

শ্রাগ করল সায়মা। 'জানি না। এখন চলি, ডিনারের সময় হয়েছে। পরে দেখা হবে।'

দু'আঙুল তুলে নিঃশব্দে ওকে টা-টা করল রানা।

সন্ধে ছ'টা বাজে, অথচ এখনও অসহ্য গরমে হাঁসফাঁস করছে বন্দরনগরী আলেকজান্দ্রিয়া। উত্তাপের অদৃশ্য কাঁপা-কাঁপা ধোঁয়া উঠছে যেন চতুর্দিক থেকে। লাইনার জেটিতে ভিড়তে অন্যদের

নজর এড়িয়ে আগেভাগে নেমে পড়ল রানা। ভিড় এড়াতে কিছুদূর হেঁটে এসে ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল হোটেল মামুরার উদ্দেশে। কাল রাতে জাহাজ থেকে টেলিফোনে উমার দম্পতির সাথে ওর জন্যেও ওখানে রুম বুক করেছে সায়মা।

অন্যদের চেয়ে কয়েক মিনিট আগে হোটেলে পৌঁছল ও। চেক্ ইন করে এক বেলম্যানকে টিপস্ দিয়ে মালপত্র নিজের ছয়তলার রুমে পাঠিয়ে দিল, প্রায় তখনই বেরিয়ে পড়ল আবার। ম্যাগাজিন কিয়স্ক থেকে শহরের একটা ডিটেইলড্ ম্যাপ কিনল ও, খুঁজে বের করল জালাল আহমেদের দেয়া ঠিকানা।

শহরের পুরানো অংশে জায়গাটা, স্টীল আর কাঁচের হাই-রাইজ ভবনওয়ালা নতুন শহর থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে। সময় আছে, তাই হেঁটেই যাবে ঠিক করল রানা। পিছনে সতর্ক নজর রেখে পা চালাল। জায়গামত পৌঁছতে পনেরো মিনিট লাগল, বাড়িটা খুঁজতে আরও পাঁচ মিনিট। এটাও সরু গলির ভেতরে। দীর্ঘ গলি।

ভেতরে কয়েকজন পথচারীকে পাশ কাটাল ও, কেউ ফিরেও তাকাল না। যত ভেতরে ঢুকছে রানা, ততই ক্ষীণ হয়ে আসছে শহরের কোলাহল। নম্বর মিলিয়ে পাঁচতলা, উঁচু খিলানওয়ালা জীর্ণ বাড়িটার লবিতে এসে দাঁড়াল ও। একটা ওয়াল ডিরেকটরিতে অনেকগুলো কোম্পানির নাম দেখতে পেল, একটা বাদে আর সবগুলো আরবিতে লেখা। ওটাই খুঁজছে রানা। অফিসটা চারতলায়।

লবির এক দিকে সরু পাথরের সিঁড়ি দেখে উঠতে শুরু করল ও। দু'দিকের পাথুরে দেয়াল থেকে গরম ভাপ বের হচ্ছে। প্রতিটা ল্যান্ডিঙে জ্বলছে একটা করে বালব্। দেখে বিশ্বাস করা কঠিন যে এরকম এক ভবনে কোন ধরনের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড চলে বা চালানো সম্ভব। কোন ফ্লোরে প্রাণের সাড়া পেল না রানা,

মৃত্যুপুরীর মত নীরব গোটা ভবন।

চতুর্থতলার করিডর বেশ চওড়া এবং নির্জন। এগোল ও, নির্দিষ্ট দরজায় নক্ করল। পায়ের আওয়াজ উঠল ভেতরে, স্লাইডিং পীপহোল এক পাশে সরে গেল। ফ্যাকাসে নীল একটা চোখ দেখা দিল ওখানে। এক মুহূর্ত পর জায়গায় ফিরে এলো পীপহোল, প্রায় নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। মাঝবয়সী এক লোককে দেখল রানা। খাটো, গোলগাল মানুষ। মুখটা যেন পাথরের তৈরি, কোন অভিব্যক্তি নেই।

'রোডস্ দ্বীপের গোলাপ পছন্দ হয়েছে?' লোকটা বলল।

'একদম না। বাজে গন্ধ।'

আইডেন্টিফিকেশন কোড মিলে যেতে প্রাণের দেখা মিলল লোকটার মুখে। হাসল সে। 'ওয়েলকাম টু ইজিপ্ট।' রানা ভেতরে ঢুকতে করিডরে চোখ বুলিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল লোকটা, লক্ করে ঘুরে দাঁড়াল। 'আসুন।' রূমের আরেক মাথার এক দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে, রানাও ঢুকল পিছন পিছন।

বারো বাই বারো হবে এটা, আন্দাজ করল রানা। কাগজপত্র ছড়ানো ছিটানো একটা ডেস্ক, ওটার পিছনেরটা সহ গোটা ছয়েক খটখটে চেয়ার, একটা কাঠের ফাইলিং কেবিনেট এবং ডেস্কের বাঁ দিকে আরও একটা নিচু ফাইল র‍্যাক, এছাড়া আর কোন আসবাব নেই। র‍্যাকের ওপর তিনটে টেলিফোন, একটা লাল। অফিসটা দেখতে যেমনই হোক, ভাবল রানা, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

'আমি মাসুদ পাশা,' বলল লোকটা। 'সফর কেমন হলো?'

'মোটামুটি,' শ্রাগ করল রানা।

'আমরা জানতে পেরেছি তাবাস্সুম পার্টি আপনার সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে তমিজউদ্দিন।' এক বাক্স দামী চুরুট ওর দিকে এগিয়ে দিল মাসুদ পাশা, মাথা নেড়ে সিগারেট বের করে ধরাল রানা।

ভাবনায় পড়ে গেছে। কেন খোঁজখবর নিচ্ছে ব্যাটা? সায়মার বক্তব্য বিশ্বাস করেনি? নাকি ইসমাইল উমার...

'উমার দম্পতি সম্পর্কে বলুন, প্লীজ!'

কাগজপত্রের ওপর থেকে একটা শীট টেনে নিল লোকটা। চোখ বোলাতে লাগল। 'ফারদিনের জন্ম পোর্ট সাঈদে,' মুখ না তুলে বলে যেতে শুরু করল। বাপ-মা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এতিমখানায় বড় হয়েছে, আঠারো বছর বয়সে, অর্থাৎ ছয় বছর আগে হঠাৎ করে প্যারিসে উদয় হয় সে। কার সাথে, কী ভাবে ওদেশে গেছে, জানা যায়নি। তার পরিচিত তেমন কাউকে পাওয়া যায়নি যে মেয়েটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারে। সেই থেকে এবার নিয়ে চারবার কায়রো এসেছে ও। শোনা যায়, মেয়েটা তাবাস্‌সুমের ক্রেজি ফ্যান।'

'আমি শুনেছি উল্টো,' রানা বলল। 'প্যারিসের এক ক্লাবে গান শুনে নাকি ফারদিনের গলার খুব প্রশংসা করেছিল তাবাস্‌সুম। সে যাক্, ও কি সত্যি গায়িকা?'

'তা বলা যায়,' মাথা দোলাল পাশা। 'প্যারিসের ছোটখাট সিং-ফর-ইওর-সাপার ধরনের ক্লাবগুলোয় কিছুদিন সত্যিই গান গেয়েছে।'

'ওর স্বামী সম্পর্কে কিছু জানা গেল?'

'হ্যাঁ,' মাথা কাত করে টেনে বলল লোকটা। 'তারটা ভিন্ন ধরনের কাহিনী। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।'

'কী রকম?'

'লোকটার কোন অস্তিত্বই নেই।'

'পার্ডন?' ঝুঁকে বসল রানা।

'ইসমাইল উমার নামে কোন মিশরীয় নেই। নেই মানে, আছে একজন। তার বয়স মাত্র ছয়। আরও দু'জন ছিল, একজন ইয়ম কিপপুরের যুদ্ধে মারা গেছে। অন্যজনও মৃত। সুয়েজ খালে এক

ইয়ট দুর্ঘটনায় মারা গেছে সে। তাও আট বছর আগে।'

'আই সী!'

'এই ইসমাইল উমারের ফরাসী পাসপোর্ট ভুয়া। ফ্রান্স কস্মিনকালেও এ নামে কোন পাসপোর্ট ইস্যু করেনি।'

কিছুক্ষণ ভাবল রানা। তারপর নিচু গলায় বলল, 'সে যাই হোক, এই লোকটাকে আগে কোথাও দেখেছি আমি। কিন্তু কোথায় দেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারছি না।'

'আপনি শিওর?'

'হান্ড্রেড পার সেন্ট,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও।

কাগজ-কলম নিয়ে প্রস্তুত হলো কামাল পাশা। 'ব্যাটার বর্ণনা দিন তো! দেখি এই লাইনে কিছু করতে পারি কী না!'

মাথা নাড়ল রানা। 'অত সময় পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। ওরা যদি সিরিয়াসলি আমার সম্পর্কে খোঁজাখুঁজি শুরু করে, কাভার ফেঁসে যাবে। তবু, লিখুন।'

ইসমাইলের নিখুঁত বর্ণনা দিল ও। সমস্ত তথ্য যত্নের সাথে টুকে নিল পাশা। তারপর বলল, 'কায়রোয় খোঁজ নিয়ে দেখি কিছু জানতে পারি কিনা।'

'এদের ভিসা ইস্যুর ব্যাপারটা?'

'ও হ্যাঁ, আমাদের ইমিগ্রেশন অথরিটির এক হাই অফিশিয়াল, হাদি আজিয়ার হাত ছিল এর পিছনে।'

ওমর আজিজের কথা মনে পড়ল রানার হঠাৎ করে। ব্যাপারটা খুলে বলতে হাসল মাসুদ পাশা। 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার বস্ মাহমুদ বে ওকে পাঠিয়েছিলেন ক্রুনো ডিয়েট্রিচকে সন্দেহমুক্ত করার মিশনে। আপনার বসের অনুরোধে।'

মনে মনে হাসল ও বুড়োর দূরদৃষ্টির কথা চিন্তা করে। 'তাতে সম্ভবত কাজের কাজ হয়নি কিছু,' বলল মৃদু গলায়। 'কাছেপিঠে

কেউ ছিল না তার ইন্টারোগেশনের সময়।'

চোখ দুটো সামান্য বিস্ফারিত হয়ে উঠল পাশার। 'অফকোর্স ছিল। আপনার সামান্য পিছনেই ছিল ফারদিন। ও সব শুনেছে।'

'আচ্ছা!' বিস্মিত হলো রানা।

'হ্যাঁ। আজিজ জানিয়েছে আমাকে। তাকে আর যা-ই হোক, অন্তত ফাঁকা মাঠে গোল দিতে পাঠাননি আমার বস্।'

'কিন্তু তারপরও তো সন্দেহ থেকেই গেল ব্যাটাদের।'

'হ্যাঁ। দ্যাট'স ভেরি আনফরচুনেট।'

হোটেলে ফিরে লবি থেকে সায়মার রুমে ফোন করল মাসুদ রানা। কিন্তু সাড়া পেল না। নেই ও। চিন্তিত মনে ডাইনিং হলের দিকে চলল রানা। লিফটটাকে পাশ কাটাবার সময় তমিজউদ্দিনের ওপর চোখ পড়ল। লিফট থেকে নামছে সে, আর ইসমাইল; তাদের সঙ্গে এথেন্সে প্রথমদিন দেখা সেই দুই আফ্রিকান ষণ্ডা। কেউই খেয়াল করেনি রানাকে, ব্যস্ত। তমিজউদ্দিন একনাগাড়ে কথা বলছে।

শেষ দুটোকে এথেন্সে দ্বিতীয়বার চোখে পড়েনি ওর, তবে জাহাজে বারদুয়েক দেখেছে। সেকেন্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জার ছিল। ব্যাটাদের আলোচনার ভঙ্গি পছন্দ হলো না, সন্দেহ ঢুকে গেল মনে।

রাত হয়ে গেছে, ডাইনিং হলে লোকজন কম। এখানেও পাওয়া গেল না সায়মাকে। গেল কোথায়? ডিনারের অর্ডার দেয়া সবে শেষ করেছে, এমন সময় ফারদিনের ওপর চোখ পড়ল রানার। সে-ও দেখল, দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু হাসল নার্ভাস ভঙ্গিতে। মেয়েটাকে গভীর বনে হারিয়ে যাওয়া হরিণছানার মত লাগল রানার।

হাত নাড়ল ও। 'মিসেস উমার! উড ইউ কেয়ার টু জয়েন

মি?’

এগিয়ে এলো মেয়েটা। মুখে হাসি, কিন্তু নার্ভাস। এবং অতিরিক্ত সতর্ক। কাছে এসে লজ্জিত হাসি হাসল সে। ‘ইয়েস…আহ্, হের ডিয়েট্রিচ। সবাই খেয়ে নিয়েছে, তাই…’

‘দ্যাট’স অলরাইট, আসুন।’ মেয়েটাকে বসতে সাহায্য করল রানা। সতর্ক ঘণ্টী বাজছে মাথার মধ্যে—এমন করছে কেন এ মেয়ে? ঘটছেটা কী এখানে? এই প্রথমবারের মত ভাল করে ওর ওপর নজর বোলাল রানা। প্রথমবার ফারদিনকে দেখে তেমন আকর্ষণীয় মনে হয়নি, কিন্তু এখন হচ্ছে।

মৃদু নীল রঙের লো-কাট, টাইট ফিট গাউন পরে আছে ও, ওপরে শর্ট জ্যাকেট। মানুষ ছোটখাট হলেও মোটামুটি আকর্ষণীয় ফিগার। চুল যত্ন করে বাঁধায়, এবং মুখে মেক-আপ লাগানোয় আজ বয়স আরও কম মনে হচ্ছে। এতরাতে এরকম সাজগোজ কিসের জন্যে? দু’জনের জন্যে অর্ডার দিল রানা, টেবিলে দু’হাতের ভর রেখে ঝুঁকে বসল। অনবরত অর্থহীন ভ্যাড়ভ্যাড় করে যাচ্ছে ফারদিন, যেন মন দিয়ে শুনছে ও।

এক সময় তার স্টক ফুরিয়ে যেতে রানা মুখ খুলল। রূপের প্রশংসা দিয়ে শুরু করে মোড় ঘুরিয়ে দিল। ‘এত নার্ভাস কেন আপনি? কোন সমস্যা হয়নি তো?’

‘সমস্যা!’ হাসল ফারদিন, আনাড়ির মত। ‘না, না! কোন সমস্যা হয়নি। চারদিকে এতসব ডানাকাটা পরীর মাঝে নিজেকে বেমানান লাগছে আমার। তাই…হয়তো…’

তার নজর অনুসরণ করে ঘুরে তাকাল রানা। হলরূমের ওপর নজর বোলাল। ‘কই, আপনার মত সুন্দরী তো দ্বিতীয়টা চোখে পড়ছে না!’

ব্লাশ করল ফারদিন। ‘আমি তা বলিনি। বলেছি, ওদের দামী দামী ড্রেস, সে-সব পরার ধরন, এইসব আর কী! ওদের

জুয়েলারি। ডিয়ার গড! ওই মেয়েলোকটিকে দেখুন!'

তাকাল ও। হাস্যকর রকম স্থূল এক মহিলা। বয়স কম করেও পঞ্চাশ, অনুমান করল রানা। পরনে ক্যাটকেটে সবুজ ড্রেস। আঙুল, কব্জি আর গলা ভর্তি গহনা ঝলমল করছে। মহিলার ম্যানিকিওর, মেকআপ ও হেয়ারডু ইত্যাদির পিছনে কম করেও দেড়শো ডলার খসেছে আজ স্বামী বেচারার।

'পয়সাওয়ালা দেখলে অস্বস্তিতে ভোগেন?' রানা বলল।

'হ্যাঁ, একটু একটু। মনে হয়, আমি এদের কাছে আসার যোগ্য হইনি এখনও।'

'কোন একদিন হবেন, এই তো?'

'হ্যাঁ!' মাথা ঝাঁকাল। 'আশা আছে আর কী!'

'আপনার স্বামীর পেশা কী?' প্রশ্ন করল রানা।

'ব্যবসা,' এক কথায় ঝামেলা শেষ করে দিল ফারদিন। চেহারা দেখেই বোঝা যায় এ নিয়ে আর কথা বলতে রাজি নয়।

রানাও জোর করল না। খাওয়ার ফাঁকে অন্য প্রশ্ন তুলল। 'তাবাস্সুমের সাথে কোথায় পরিচয় আপনার?'

'প্যারিসের এক পার্টিতে।'

'আপনিও তো হোটেল সিঙ্গার?' বলল ও।

মাথা ঝাঁকাল সায়মা। 'সেই জন্যেই দেশে ফিরে এলাম। এলাম মানে, কায়রোর নামকরা এক হোটেল ধরে এনেছে অ্যাকচুয়ালি।'

'তাই নাকি?'

খাওয়া শেষে ব্র্যান্ডি পানের ফাঁকে ফারদিনকে সিগারেট অফার করল রানা, কিন্তু মাথা নাড়ল সে। 'ধন্যবাদ, আমি আমার নিজের ব্র্যান্ড...' ব্যাগ হাতড়াল খানিক। 'এই যাহ্! ভুলেই গিয়েছিলাম সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। ভেবেছিলাম লবি থেকে কিনব, কিন্তু...'

হাসল রানা, 'কী আর করবেন! এখন আমার ব্র্যান্ড দিয়েই কাজ চালিয়ে নিন না হয়।'

নিল ফারদিন, তবে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে। আরও কিছু সময় চলল গল্পগুজব। এরমধ্যে নার্ভাসনেস কেটে গেছে ফারদিনের, খেয়াল করল রানা। ক্রমে তার জায়গা দখল করছে প্রত্যয়। ও যে কিছু একটা মতলব নিয়ে এসেছে, রানা আগেই অনুমান করেছিল, এখন যে-কোন মুহূর্তে যে সে-প্রসঙ্গ উঠবে, অথবা তার আলামত দেখা দেবে, তাও বুঝতে অসুবিধা হলো না।

ধূমপানের ফাঁকে ওর সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্ন করল ফারদিন। অনেকটা জেরা করার মত। কিন্তু তাবাস্সুমের মত কৌশলী নয় এ, তোতা পাখির মত মুখস্থ প্রশ্ন শুনে দু'মিনিটেই বুঝে ফেলল রানা। খানিক পর চেকে সই করে উঠল ও, মেয়েটাও উঠল। ডেস্ক থেকে চাবি নিল রানা। ফারদিন নিজের জন্যে দু'প্যাকেট সিগারেট কিনল।

লিফটে উঠে ওর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল সে। চাউনি চকচকে হয়ে উঠল। 'আমার স্বামী বলে, আপনাকে দেখে খুব বিপজ্জনক মানুষ মনে হয়,' ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে বলল।

'তাই নাকি?'

'আপনি খুব...খুব আকর্ষণীয়ও,' অপ্রস্তুতের মত হাসল ফারদিন। 'আমাকে নির্লজ্জ মনে হচ্ছে না?'

'একদম না,' মাথা নাড়ল রানা।

'ইসমাইল বাইরে গেছে,' প্রায় ফিস্ফিস করে বলল। 'রাতে ফেরার চান্স নেই,' আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল।

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ। প্রায়ই রাতে বাইরে থাকে ও।'

মুচকে হাসল রানা। 'আজও সেরকম মতলব আছে নাকি তার?'

'তবে আর বলছি কী? আমার ইচ্ছে আজকের রাত আপনি-আমি...' লিফট খুলে যেতে থামল ফারদিন।

'আমার কোন আপত্তি নেই,' রানা বলল। 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমারও কিছু জরুরী কাজ আছে যে রাতে। বাইরে যেতে হবে।'

ফারদিনের চেহারায় চরম হতাশা ফুটে উঠল। 'কিন্তু...এতবড় রাত...একা এক রুমে থাকতে যে ইচ্ছে করছে না আমার।'

'দুঃখিত, ফারদিন। আমাকে বেরোতে হবে।' নিজের দরজার কী স্লটে চাবি ঢোকাল ও।

মরিয়া হয়ে উঠল মেয়েটা। বলল, 'কিন্তু তুমি বলেছ আমার মত সুন্দরী দ্বিতীয়টা...'

'ফারদিন!' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। ভেতরে ভেতরে বিরক্ত। 'নিজের রুমে যাও।'

'কিন্তু তুমি না বললে...'

'তখন যা বলেছি, এখনও তাই বলছি। তুমি আসলেই সুন্দরী। গুড নাইট, কাল দেখা হবে।'

'এক মিনিট,' দ্রুত বলল মেয়েটা। 'অন্তত নাইটক্যাপের জন্যেও কি একটু ভেতরে আসতে বলবে না?'

একটু ভাবল ও। 'অল রাইট, এসো।'

পাঁচ মিনিট পর ফারদিনকে প্রায় জোর করে বিদেয় করল রানা। দরজা লাগিয়ে দিল। সায়মা কেন যোগাযোগ করল না ভেবে চিন্তিত। এই হোটেলেই আছে ও, একই ফ্লোরে, অথচ...ভাবতে ভাবতে ফোনের রিসিভার তুলেও রেখে দিল। এখান থেকে ফোন করা ঠিক হবে না। জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।

নিচের লবিতে এসে ফোন বুদ থেকে চেষ্টা করল রানা, কাজ হলো না। রিং হচ্ছে, সায়মার সাড়া নেই। মনের মধ্যে বিশ্রী সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। হঠাৎ কী এমন ঘটল? ওরা

জেনে ফেলেছে রানার আসল পরিচয়?

বুদ থেকে বের হতে গিয়েও হলো না ও। তমিজউদ্দিন আর ইসমাইল ঢুকছে লাউঞ্জে, বাইরে থেকে আসছে। আফ্রিকান দুটো নেই। পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে লিফট ব্যাঙ্কের দিকে, চিন্তিত। ওরা লিফটে উঠতে বেরিয়ে এলো রানা, তাড়াতাড়ি আরেক লিফটে উঠল। এক মিনিটের কম সময়ের ব্যবধানে ছয়তলায় উঠে এলো রানা। লিফট থেকে বেরিয়ে করিডরে পা রাখতেই ওর তিন কামরা পরের রুমের দরজা মৃদু শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। উমার দম্পতির রুম ওটা। দ্রুত, পা টিপে এগোল ও। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে কান পাতল দরজাটার গায়ে। একই মুহূর্তে ইসমাইলের হুঙ্কার শুনতে পেল।

'বের করে দিয়েছে মানে?'

'কসম করে বলছি,' ফারদিনের চিঁ-চিঁ স্বর জবাব দিল। 'আমি অনেক চেষ্টা করেছি থাকার, দিল না লোকটা। জোর করে...'

চড়াৎ করে একটা আওয়াজ, সেই সাথে মেয়েটার আর্ত চিৎকার শুনতে পেল রানা। পরক্ষণে তমিজউদ্দিনের গলা ভেসে এল। 'আহ্, ক্যাপ্টেন! কেন শুধু শুধু মারছ ওকে? ওর কী দোষ? যে-জন্যে পাঠানো হয়েছিল, সে-কাজ...'

ক্যাপ্টেন! সে আবার কে? ভাবল রানা। ইসমাইল?

'তুমি বুঝতে পারছ না,' তর্ক শুরু করে দিল ইসমাইল। 'এই হারামজাদীর...'

'হয়েছে!' তীক্ষ্ণ চাবুকের মত শোনাল তমিজউদ্দিনের ধমক। 'সরে এসো তুমি, আমাকে কথা বলতে দাও ওর সাথে।'

এরপর অনেকক্ষণ কিছুই শুনতে পেল না রানা। ভেতরে মেয়েটির সাথে তমিজউদ্দিনের কথা হচ্ছে, ঠিকই শুনতে পারছে, কিন্তু যথেষ্ট স্পষ্ট আর জোরাল নয়। কে কী বলছে বুঝতে পারছে

না। একটু পর আবার শোনা গেল ইসমাইলের খ্যাঁকানি।

'শুনেছ! শুনেছ ছেনাল মাগীর কথা? ঘুমের ওষুধটাও ব্যাটার ড্রিঙ্কের সাথে...'

'তুমি থামবে দয়া করে?' তমিজউদ্দিন বলল।

এদিকে, এতক্ষণে রানা বুঝল ফারদিনের আসল মিশন কী ছিল। পানীয়ের সাথে ওকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে চেয়েছিল মেয়েটা। প্রথমবার চেষ্টা করেছিল ডাইনিং হলে। হাতব্যাগ থেকে সিগারেট বের করতে গিয়ে 'ফুরিয়ে গেছে' ঘোষণা করে।

হয়তো ভেবেছিল রানা ভদ্রতার খাতিরে লবি থেকে কিনে এনে দেবে, সেই ফাঁকে ওর ব্র্যান্ডিতে মিশিয়ে দেবে। সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ওর রূমে যেতে চেয়েছিল ফারদিন।

'যাক, যা হবার হয়ে গেছে,' তমিজউদ্দিনের গলা শুনে সচকিত হলো ও। 'ভেবো না, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। এখানে হলো না, তাতে কী? কায়রোয়...'

'তোমাকে বলেছি লোকটা প্রথম থেকেই সন্দেহের চোখে দেখছে আমাকে। যে-কোন মুহূর্তে চিনে ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে কী ঘটবে তুমি ভালই জানো। ইজিপ্ট পুলিস...'

'তুমি অহেতুক ভাবছ, ক্যাপ্টেন,' তমিজউদ্দিন বাধা দিল। 'কিছুই ঘটবে না। আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপরই চলে যাচ্ছি আমরা। যদি এর মধ্যে তেমন কিছু ঘটে, খবর পেয়ে যাব আমি। কিছু ঘটার আগেই আমি সরিয়ে ফেলব তোমাকে, হলো?'

৮

আট

রুম সংলগ্ন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। রাত গভীর হচ্ছে, শহরের কোলাহল কমে আসছে। দূরে লাইট হাউসের আলোয় চিক্‌চিক্‌ করছে ভূমধ্যসাগরের খানিকটা। জোর বাতাস বইছে। বিস্বাদ লেগে ওঠায় সদ্য ধরানো সিগারেটটা টোকা মেরে দূরে ছুঁড়ে দিল ও। উদ্বিগ্ন।

ইসমাইলকে চিনতে পেরেছে ও। সেটাই উদ্বেগের কারণ। ওর নাম ইসমাইল নয়, ফারুক। ফারুক হাসনাইন। মিশরীয় এয়ারফোর্সের ফাইটার পাইলট ছিল এক সময়। কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল এদেশের একটা গোঁড়া ধর্মান্ধ গোষ্ঠি, সামরিক বাহিনীর কিছু অফিসারও হাত মিলিয়েছিল তাদের সঙ্গে।

ফারুক হাসনাইন তার মধ্যে একজন। শেষ সময়ে ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ষড়যন্ত্রকারীদের অনেকে ধরা পড়ে, কয়েকজন দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই লোক তাদের একজন। ষড়যন্ত্র যখন ফাঁস হয়, রানা তখন কায়রোতেই ছিল এক বিশেষ অ্যাসাইনমেন্টে।

ধরপাকড়ের সময় পত্রিকায়-টিভিতে ব্যাপক প্রচার পায় ঘটনাটা। বিশেষ করে যে ক'জন পালিয়ে যেতে পেরেছিল, তাদের ব্যাপারে খুব বেশি গুরুত্ব দেয় মিডিয়া। এত ছবি ছাপা

হয়, দেখতে দেখতে সবার চেহারা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল ওর। এই জন্যেই লোকটাকে চেনা-চেনা লেগেছে প্রথম থেকেই। নিশ্চিত হতে না পারার আরও দুটো কারণ আছে। এক, সে সময়ে দাড়ি রাখত ফারুক, এখন ক্লীন শেভড্ এবং দুই, বর্তমানের ছদ্মনাম।

এই লোক তমিজউদ্দিনের সাথে যোগ দিয়েছে কেন? মিগ-২৯ ওড়ানোর জন্যে? তারপর কী? কোথায় আছে প্লেনটা? সায়মা কোথায়? অস্থির চিত্তে ব্যালকনিতে কিছুক্ষণ পায়চারি করল রানা।

সায়মা বা তাবাস্সুমের দেখা নেই কেন? আরেকবার চেষ্টা করে দেখবে সায়মাকে ফোনে পাওয়া যায় কী না?

মন সায় দিল না রানার। কে জানে, তাতে হয়তো ওকে নতুন বিপদে জড়ানো হবে।

সকাল ন'টায় কায়রোর উদ্দেশে রওনা হলো পাঁচ জনের দলটা–তাবাস্সুম, সায়মা, ফারদিন, তমিজউদ্দিন আর ফারুক হাসনাইন। আজব ব্যাপার, যাওয়ার সময় সায়মা বাদে আর সবাই রানার সাথে দেখা করে ওর ট্রেন যাত্রার সাফল্য কামনা করে গেছে। তমিজউদ্দিন ও ফারুক এমন ভাব করেছে যেন সব ঠিক আছে। কিছুই ঘটেনি। এমনকি ফারদিন পর্যন্ত। গাড়িতে জায়গার অভাবে ওকে সঙ্গে নিতে না পারার আফসোস এবং কায়রোয় দেখা হওয়ার আশা প্রকাশ করে গেছে প্রত্যেকে।

কেবল সায়মা আসেনি। ওকে কোথাও দেখতে পায়নি রানা। শেষ মুহূর্তে, গাড়িতে ওঠার সময় এক পলক দেখেছে কেবল দূর থেকে। আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রায় পনেরো ঘণ্টা পাশাপাশি থেকেও মেয়েটাকে সেই ওর প্রথম ও শেষ দেখা।

তাবাস্সুমের ক্যাডিলাক হোটেল কম্পাউন্ড ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই নিজের রুমের দিকে পা বাড়াল রানা। গোছগাছ সেরে ওকেও বেরোতে হবে, দু'ঘণ্টা পর ট্রেন ছাড়বে। রাতে একবার

ভেবেছিল নিজেও গাড়িতে করে ওদের পিছু নেবে। চোখের আড়াল হতে দেবে না। কিন্তু পরে বাতিল করে দিয়েছে সে চিন্তা। কেননা তার আসলে প্রয়োজন নেই।

রানাকে যখন চিনেই ফেলেছে, তখন ওর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হয়ে আসল কাজে হাত দেবে না তমিজউদ্দিন। নিজেদের গরজেই রানার কায়রোতে উদয় হওয়ার অপেক্ষায় থাকবে। এবং ও যাতে নিশ্চিন্ত মনে যায়, সে জন্যেই নাটক করে গেছে শেষ মুহূর্তে।

রুমের দরজার সামনে হাউস কীপারের অ্যাপ্রন পরা মোটা এক বৃদ্ধাকে দাঁড়ানো দেখেও খেয়াল করল না রানা, পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল। বৃদ্ধা কিছু বলে উঠতে ফিরে তাকাল, দেখল এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ বাড়িয়ে ধরে আছে সে। ওটা নিল রানা, ভাঁজ খুলে দেখল। ছোট্ট একটা চিঠি, সায়মার লেখা।

বৃদ্ধাকে বিদেয় করে ওখানে দাঁড়িয়েই চিঠিটা পড়ল রানা। ওটা এরকম:

> কাল রাতে অনেক চেষ্টা করেও তোমার সাথে দেখা করতে পারিনি। কাজের অজুহাতে আটকে রেখেছিল নীল, এমনকি একটা ফোন করার সুযোগও দেয়নি। শেফার্ড'স হোটেলে দেখা করব। রাতে। ভালবাসা।

নীল কেন ওকে আটকে রেখেছিল আঁচ করতে পারছে রানা। সে চায়নি ওকে স্কোপোলামিন গিলিয়ে ফারুকের জেরা করার সময় ওর রুমে ঢুকে পড়ুক সায়মা, তাই।

একটু পর চেক আউটের জন্যে ডেস্কে ফিরে এলো ও। বিল তৈরি করাই ছিল, পরিশোধ করে দিল। ড্রয়ার থেকে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল ক্লার্ক। 'আপনার কায়রো এক্সপ্রেসের

টিকেট, সার।'

ওটা নিল রানা। 'থ্যাঙ্কস।'

'আপনি চাইলে আপনার ব্যাগেজ ট্রেনে তুলে দিতে পারি আমরা, সার।'

দুটো পঞ্চাশ ডলারের নোট লোকটার হাতে গুঁজে দিল ও। বড় সুটকেসটা দেখাল। 'শুধু ওটা পাঠিয়ে দিন। ব্রীফকেস আমিই নিয়ে যাচ্ছি।'

বেরিয়ে এলো রানা হোটেল থেকে। কয়েক পা যেতে না যেতেই বুঝল কেউ পিছু নিয়েছে। যেন কিছু ফেলে এসেছে, এমন ভঙ্গি করে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। দু'পা এসে থেমে প্যান্টের পকেট চাপড়ে হাসল। মাথা নেড়ে আবার ঘুরল, হাঁটতে লাগল যেদিকে যাচ্ছিল।

লোকটা ওর সমান লম্বা, হাল্‌কা-পাতলা। পরনে গাঢ় রঙের বিজনেস সুট। এতক্ষণ তিন কদম পিছনে ছিল, রানার চাতুরীর ফলে সামনে এগিয়ে গেছে এখন। ফেঁসে গিয়ে হাঁসফাঁস করছে। একটু জোর পায়ে এগোল রানা, প্রায় ধরে ফেলেছে ব্যাটাকে। ভাবছে, কে ব্যাটা?

তখনই কথা বলে উঠল সে। 'মিস্টার মাসুদ পাশা পাঠিয়েছেন আমাকে, মিস্টার রানা.' আরেকদিকে তাকিয়ে, ঠোঁট প্রায় না মেড়ে বলল।

'কেন?'

'আপনার সফরসঙ্গী প্রত্যেকের ছবি আর হাতের ছাপ নিতে।'

'তারপর?'

'নিয়েছি, সার। ফারদিন আর ইসমাইল উমারের হাতের ছাপও নেয়া হয়েছে।'

'ইসমাইল নয়, ওর নাম ফারুক। ফারুক হাসনাইন।'

'সার!' ভেতরের বিস্ময় চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করল না

লোকটা। 'ব্যাটাকে চেনেন আপনি?'

'কয়েক ঘণ্টা আগে চিনেছি,' বলল ও। 'বছর কয়েক আগে মিশরীয় ফাইটার পাইলট ছিল।'

'অ্যা!' দাঁড়িয়ে পড়তে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সামলে নিল লোকটা। 'সেই...'

'আমাকে ফলো করছিলেন কেন?'

'মিস্টার পাশা জানতে চাইছিলেন আপনার কোনও লাস্ট মোমেন্ট মেসেজ বা ইন্সট্রাকশন আছে কী না।'

না বলতে যাচ্ছিল রানা। অন্য চিন্তা মাথায় ঢুকতে মত পাল্টাল। 'আছে। বলবেন, তাবাস্সুম পার্টির ওপর নজর রাখতে হবে। কিন্তু খুব সাবধানে। আর আমি কায়রো ফিরেই আপনাদের চীফ, মাহমুদ বে-র সাথে দেখা করব মাসুদ পাশার দেয়া ঠিকানায়। ভদ্রলোক যেন সময়মত ওখানে থাকেন।'

'ওকে, সার। ফি আমানিল্লাহ্।'

রানা হাত তুলতে ক্যাবস্ট্যান্ড থেকে একটা ট্যাক্সি এগিয়ে এল। ওর গা ঘেঁষে থেমে মিটার ডাউন করে দিল ড্রাইভার, ব্রীফকেস ভেতরে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে বসল রানা। গাড়িঘোড়ার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল ট্যাক্সি।

কাঁটায় কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়ল কায়রো এক্সপ্রেস। ক্রমে পিছিয়ে যেতে লাগল আলেকজান্দ্রিয়া। যত পিছাচ্ছে, ততই বাড়ছে সবুজের বিস্তার। এদের রেললাইন বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের মত ওয়াইড-গজ। তাই কারগুলোও চওড়ায় বেশি। ইওরোপের ট্রেনের চেয়ে বেশি আরামদায়কও, ওর অন্তত সেরকমই মনে হলো। কার্পেট বেশ পুরু, নরম।

নিজের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের দরজা লাগিয়ে গুছিয়ে বসল রানা। বাইরের দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ প্রান্তরের দিকে তাকাল। তুফান বেগে নীলনদের ব-দ্বীপের উদ্দেশে ছুটে চলেছে এক্সপ্রেস।

শেফার্ড'স কায়রোর গার্ডেন সিটি অংশে। এটা নতুন তৈরি, মূল শেফার্ড'স ছিল অপেরা স্কয়্যারের কাছে। ১৯৫২ সালে বাদশাহ ফারুককে ক্ষমতাচ্যুত করতে নাসেরের নেতৃত্বে সংগঠিত বিদ্রোহের সময় জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল সেটা। ক্ষিপ্ত জনতা প্রথমে লুট করে তারপর আগুন দিয়েছিল, কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না।

বর্তমানেরটা নির্মিত হয় ১৯৫৬ সালে। আগেরটার মত এটাকেও মূরিশ ও ভিক্টোরিয়ান স্টাইলে নির্মাণ করার চেষ্টা নেয়া হয়েছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয় তা। তবে এখনও, কায়রোয় যত নামী-দামী হোটেলই থাকুক, একমাত্র শেফার্ড'স-ই পেরেছে অতীত মিশরের ঐতিহ্য কিছুটা ধরে রাখতে।

সন্ধের একটু পর চেক-ইন করল রানা, এক বেলবয়কে দিয়ে লাগেজ রুমে পাঠিয়ে দিয়ে ক্লার্কের দিকে ফিরল। 'আমার এক বন্ধুর সস্ত্রীক আসার কথা ছিল। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ইসমাইল উমার,'-বলল ও। 'এসেছেন ওঁরা?'

'এসেছেন, সার,' কী-বোর্ড দেখে নিয়ে বলল লোকটা। 'স্যুইট সাতশো বারো। কথা বলবেন? স্যুইটেই আছেন ওঁরা।'

'না, ধন্যবাদ। এখন না। এসে যখন পড়েছি, কথা হবেই।'

'রাইট, সার।'

কাউন্টার থেকে সরে এলো রানা। ও উঠেছে আটশো বারো নম্বরে। ওরা সাতশো বারোতে অর্থাৎ ঠিক ওর নিচের স্যুইটে, ভাবল রানা। কী খেয়াল হতে ফের এগোল কাউন্টারের দিকে। 'এক্সকিউজ মি, ওদের সাথে আরও দুই ভদ্রলোকের ওঠার কথা ছিল। সাম আজিজ অ্যান্ড...?'

এবার কী-বোর্ডের দিকে তাকানোর প্রয়োজন মনে করল না ক্লার্ক। 'না, আর কেউ তো ছিল না, সার!'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'থ্যাঙ্কস।' লিফটের দিকে এগোল।

কয়েক পা গিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখল লোকটা ওকে লক্ষ করছে কি না। না, করছে না। নতুন আসা গেস্টদের সাথে কথায় ব্যস্ত। অমনি অ্যাবাউট টার্ন করল ও, লাউঞ্জে ঢোকার মুখে একসার ফোনবুদ আছে, তার একটায় এসে ঢুকল।

মাসুদ পাশার দেয়া একটা নম্বরে ফোন করল। প্রথম রিং শেষ হতে না হতে জবাব এল। 'আসাল্লাহ্ ড্রাগস্।'

'আমার প্রেসক্রিপশন প্রয়োজন।' নজর লবিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর। কেউ নজর রাখছে কী না বোঝার চেষ্টা করছে।

'এক সেকেন্ড...' একটু পর অন্য এক কণ্ঠ শোনা গেল। 'পার্ডন, সার?'

কথাটা পুনরাবৃত্তি করল রানা।

'রোগের প্রকৃতি না জেনে প্রেসক্রিপশন দিই না আমরা। চলে আসুন।'

'ডাক্তার আছেন তো?'

'আছেন।'

'ওকে, আধ ঘণ্টা।' ফোন রেখে বেরিয়ে এলো রানা। ট্যাক্সি নিয়ে 'পেনশন এলো সাবাতে'র দিকে চলল। পনেরো মিনিট লাগল গন্তব্যের এক মাইলের মধ্যে পৌঁছতে। দূরত্বের কারণে নয়, ট্রাফিকের চাপের কারণে। পুরানো আর নতুন কায়রোর মাঝামাঝি জায়গাটা। গিজগিজ করছে মানুষ, পাশাপাশি চলছে যন্ত্র, ঘোড়া ও গাধা চালিত গাড়ি। সব চলছে পিঁপড়ের গতিতে।

বিরক্ত হয়ে গাড়ি ছেড়ে হাঁটা ধরল রানা। তাতে সমস্যা কমল তো না-ই, বরং বাড়ল। মানুষের ধাক্কা আর গুঁতোয় কয়েক মিনিটের মধ্যে অস্থির হয়ে উঠল ও। অনেক সংগ্রাম করে নির্দিষ্ট বাড়ির লবিতে পৌঁছল অবশেষে। ডেস্কের পিছনে এক বৃদ্ধ বসা, রানাকে দেখে চোখ কুঁচকে উঠল তার।

'আসাল্লাহ্ ড্রাগস্-এ যেতে চাই,' বলল ও।

'দোতলায়, আটাশ নম্বর,' মুখ ঘুরিয়ে সিঁড়ি দেখাল লোকটা।

উঠে এলো রানা। সামনেই ২৮ দেখে নক্ করল। আধ ইঞ্চি ফাঁক হলো পুরু কাঠের দরজা, একটা মেয়ের মুখের একাংশ দেখা গেল। 'ইয়েস?'

'ডাক্তারের সাথে দেখা করব,' বলল রানা। 'প্রেসক্রিপশন নিতে এসেছি।'

'আসুন,' ফাঁক আরেকটু বড় করল মেয়েটা।

ভেতরে চলে এলো ও। রুমটা বেশ বড়, সুন্দর সাজানো-গোছানো। মেঝেতে পুরু কার্পেট। এক মাথায় একটা ডেস্ক আর অন্য মাথায় এক সেট দামী সোফা দেখল রানা। তার একটায় ছোটখাট এক বৃদ্ধ বসা, ওকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। মুখে মৃদু হাসি। মিশরীয় গোয়েন্দা সংস্থার দোর্দণ্ডপ্রতাপ চীফ, মাহমুদ বে। মেয়েটির উদ্দেশে দ্রুত কিছু বললেন বৃদ্ধ। নীরবে বেরিয়ে গেল সে দরজা টেনে দিয়ে। 'ক্লিক্' শব্দে লেগে গেল ওটা।

হাসিমুখে রানার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন বৃদ্ধ। 'আসুন, বসা যাক,' ইঙ্গিতে সোফা দেখালেন। মুখোমুখি বসে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ওর দিকে। 'ঠিকমত কিছু প্রমাণ হওয়ার আগেই ফারুক হাসনাইনকে চিনে ফেলেছেন বলে আপনাকে অভিনন্দন, মিস্টার রানা। অনেক বড় উপকার করেছেন আপনি মিশর সরকারের।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, সার। কিন্তু এখনও কাজের কাজ কিছু করতে পারিনি। প্লেনটার খোঁজ বের করতে পারিনি।'

'মনে হয় এ ব্যাপারে আমি কিছু সাহায্য করতে পারব আপনাকে,' বললেন মাহমুদ বে। 'আমার ধারণা ওটা মিশরে নেই। লিবিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

বিস্মিত হলো রানা। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। গতকাল আমাদের একজন লিবিয়ান ইনফর্মার নতুন

এক খবর দিয়েছে। তবরুকের দক্ষিণে থাকে সে. রাখাল।'

'কী খবর দিয়েছে লোকটা?'

'তার আবার কিছু ইনফর্মার আছে। তাদের একজন নাকি কসম করে বলেছে, টেইলে লাল পতাকা আঁকা একটা মিগ প্লেন দেখেছে সে। ভোরের দিকে, খুব নিচু দিয়ে উড়ে গেছে সেটা. বড়জোর দুশো ফুট ওপর দিয়ে। অর্থাৎ ওখান থেকে কাছেই কোথাও ল্যান্ড করেছে প্লেনটা, খুব সম্ভব ওটাকে যেদিন সে দেখেছে. সেদিনই রাতে মেডিটারেনিয়ানে সো-কলড ক্র্যাশ করেছিল আপনাদের মিগ-২৯।'

চুপ করে থাকল রানা। কী বলবে বুঝতে পারছে না। এখন কী করা উচিত, তাও না।

'আপনি যদি মনে করেন কাজটা ঠিক হবে, তাহলে ফারুককে পাকড়াও করতে পারি আমরা। ওর মুখ থেকে প্লেনটার লোকেশন...'

'আমার মনে হয় না লোকটাকে তা জানানো হয়েছে,' রানা বাধা দিল। 'তমিজউদ্দিন এ পর্যন্ত যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে তার প্ল্যানিঙে, কাজে। আমার ধারণা সঠিক সময় না হওয়া পর্যন্ত আসল ব্যাপারে মুখ খুলবে না লোকটা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বৃদ্ধ। 'আমারও ঠিক তাই ধারণা।'

কিছু সময়ের নীরবতা।

'এদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেননি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কিচ্ছু না। বরং যে ভাবে হোক. উল্টে আমার কাভার ফাঁস হয়ে গেছে ওদের কাছে।'

চেহারা ক্রমে থমথমে হয়ে উঠল বৃদ্ধের। 'আপনি ঠিক জানেন?'

'হ্যাঁ।' গতরাতে মামুরা প্যালেসে যা-যা ঘটেছে, সব বলল ও।

অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্নের মত বসে থাকলেন মাহমুদ বে।

'তাহলে? এই শহরে তমিজউদ্দিনের হাত খুব লম্বা, আমি জানি। ওরা যখন আপনার কথা জেনেই গেছে বলছেন, তখন একা-একা আর এগোনো কি ঠিক হবে?'

'এগোতেই হবে আমাকে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'তমিজউদ্দিন কোন সর্বনেশে খেলায় মেতেছে জানতে হবে। ওর বিষদাঁত ভেঙে না দেয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেয়া সম্ভব নয়।'

মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। 'ফারুকের স্ত্রী হিসেবে যে মেয়েটি এসেছে, ফারদিন, ওর সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। মেয়েটা লেসবিয়ান। তাবাস্‌সুমও।'

'তাবাস্‌সুম!' বিস্মিত হলো ও। 'লেসবিয়ান!'

'পুরোপুরি লেসবিয়ান তা বলা যায় না,' শ্রাগ করলেন বৃদ্ধ। 'তবে অল্প-বয়সী মেয়েদের প্রতি বিশেষ টান আছে তার।'

তাঁর ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধে হলো না। কিন্তু তাবাস্‌সুম-ফারদিনের নোংরা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভাবছে না রানা, ভাবছে অন্য কথা। ডেস্কের ওপর রাখা টেলিফোন সেটটা দেখাল ও। 'একটা ফোন করতে পারি?'

'শিওর।'

হোটেলে ফোন করে ইসমাইলের রুমে কানেকশন দিতে বলল ও। বেশ কিছুক্ষণ পর জবাব এল, 'নো রিপ্লাই, সার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। ব্রুনো ডিয়েট্রিচ বলছি। কোন মেসেজ আছে আমার?'

'না, সার।'

'ওকে।' ফোন রেখে সায়ম্মার কথা ভাবল রানা। আজ রাতে ওর হোটেলে আসবে বলেছে মেয়েটা। আসবে তো? যদি আসে, ও তরফে কী চলছে তার কিছুটা অন্তত আভাস পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু...যদি না আসে?

মাহমুদ বে-র সাথে আরও মিনিট দশেক কথা বলে উঠল ও।

রাত বারোটার দিকে ধৈর্য পুরোপুরিই হারাল মাসুদ রানা। এখনও এলো না সায়মা, কোনভাবে যোগাযোগও করেনি, কাজেই ধরে নিয়েছে কোথাও বড় ধরনের গড়বড় ঘটে গেছে। আর আসার চান্স নেই ওর। এখন রানাকেই যেতে হবে তাবাস্‌সুমের বাংলোয়। জানতে হবে কী চলছে ওখানে। এদিকে মাহমুদ বে-র সাথে দেখা করে হোটেলে ফিরে উমার দম্পতির খোঁজ নিয়েছিল ও, তারাও নেই। রাত ন'টার দিকে বেরিয়েছে, আর ফেরেনি।

বের হওয়ার প্রস্তুতি প্রায় শেষ রানার, এমন সময় নকের শব্দ উঠল বন্ধ দরজায়। দ্রুত এগোল ও, বিস্মিত। 'কে?'

'আমি, খোলো!'

'সায়মা!' বিড়বিড় করে বলল ও। ব্যস্ত হাতে দরজা খুলে দিয়ে আরও অবাক হলো। মুখ দিয়ে আপনাআপনি বেরিয়ে গেল, 'এ কী!'

কালো বোরখা মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সায়মা। মাথা থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত ঢাকা, শুধু চোখ দুটো বেরিয়ে আছে। রানাকে দেখামাত্র চাউনিতে স্বস্তি ফুটল মেয়েটির। দীর্ঘ, টান্‌টান উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পেলে যেমন হয়, তেমনি। 'উফ্!' অস্ফুটে বলল ও।

'কী হলো, ভেতরে এসো!' হাত বাড়িয়ে দিল রানা।

ধরল না সায়মা। ওটার দিকে এমনকি তাকালও না, ওর চোখে চোখে তাকিয়ে ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকল। চোখ ছল্‌ছল্ করছে। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'সায়মা, কী হয়েছে?' ওকে ধরতে চাইল, ছিট্‌কে সরে গেল মেয়েটা।

'কে তুমি!' ফুঁসে উঠল। মুখের নেকাব তুলে দিয়েছে। ফরসা মুখটা রাগে লাল।

'মানে?' হতভম্ব হয়ে গেল রানা।

'আমি জানতে চাইছি কে তুমি?'

যা বোঝার বুঝে নিল ও। কী বলবে ভাবছে।

'তার মানে তুমি সত্যিই ব্রুনো ডিয়েট্রিচ নও! ওদের কথাই ঠিক?'

'কাদের কথা?'

'নিজের মিথ্যে পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে আমাকেই কেন বেছে নিয়েছিলে তুমি, তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল বলে? মনে মনে তোমাকে আমি কামনা করেছিলাম বলে?' দু'চোখ জ্বলে উঠল সায়মার।

'শোনো, সায়মা,' এক পা এগোল ও।

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি, মাসুদ রানা!' নামটা চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল সে। 'আগে শেষ করতে দাও।'

রানা বুঝল ও এখন প্রচণ্ড ভাবাবেগের শিকার, কোন কথাই কানে ঢুকবে না এখন। যুক্তির ধার ধারবে না। এখন ওকে বলতে দেয়াই ভাল। তাতে রাগ দ্রুত কমে আসবে, আবেগের ধোঁয়া হয়তো কেটে যাবে।

'বেশ, বলো,' আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল ও। 'বলো কী জানতে চাও। আগে বোসো। শান্ত হও, তারপর যা-যা জানতে চাও জিজ্ঞেস করো, সব জানাব আমি। কিছুই গোপন করব না।'

'গোপন করার মত আরও কিছু তাহলে আছে এখনও তোমার স্টকে?' তীব্র ঝাঁঝ ফুটল ওর কণ্ঠে।

শ্রাগ করল রানা। 'তুমি কতটুকু জেনেছ, না জানা পর্যন্ত কী করে বলি।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সায়মা। দেখা গেল চেহারার রাগ-রাগ ভাবটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

'সে রাতে ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে যে ঘটনা ঘটল, তা সাজানো ছিল?' প্রশ্ন করল মেয়েটা।

'হ্যাঁ এবং না।'

'মানে?'

'মানে, সেদিন তোমাকে মুগ্ধ করার জন্যে চারজন লোকের হামলা করার কথা ছিল আমাদের ওপর; কিন্তু দুঃখের বিষয় ওরা এসে পৌঁছবার আগেই সত্যিকারের দুই ছিনতাইকারী এসে হাজির হয়ে গিয়েছিল। ওই চারজন এসে দেখে খেল খতম।'

ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড ভাবল সায়মা। তারপর বলল:

'লন্ডন টাইমসের নিউজ কাটিং নোটবইয়ের অস্ত্র সরবরাহ করা বাবদ লেনদেনের হিসেব, সব ভুয়া ছিল?'

'ছিল,' মাথা দোলাল রানা। 'যাতে তোমার হাতে পড়ে সেজন্যে ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছিলাম ওটা পকেট থেকে।'

'আমাদের সাথে একই হোটেলে, তারপর জাহাজে পাশাপাশি থাকা, এর সবই আগে থেকে ঠিক করা ছিল?'

'ছিল।'

'এথেন্সে পা রেখেই আমার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলবে, সেটাও?' বলল সায়মা।

'না, সায়মা। তেমন কোন প্ল্যান ছিল না আমার। ছিল তুমি হও বা নীল, যে কোন একজনের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করব তমিজউদ্দিন পৌঁছার আগেই। সময়মত তোমাকে পেলাম...'

'কী কপাল আমার!' অনেকটা যেন নিজেকে শুনিয়ে বলল মেয়েটা। 'জীবনে যাকে প্রথম ভাল লাগল, আজ জানলাম সে ভুয়া পরিচয়ে...'

'পরিচয়ে কী আসে-যায়, সায়মা? মানুষটা তো একই। যাকে তোমার ভাল লেগেছে, সে ব্রুনো ডিয়েট্রিচ না হয়ে মাসুদ রানা হলোই বা, তাতে ক্ষতি কী? তুমি তো নামকে ভালবাসোনি, বেসে থাকলে বেসেছ আমাকে। আমার তো কোন পরিবর্তন হয়নি। নাকি হয়েছে? তাছাড়া আমি তো তোমাকে সতর্ক করেছি, বলেছি,

আমাকে নিয়ে কোন স্বপ্ন দেখো না। অসময়ে ভেঙে যাবে সে স্বপ্ন। তুমি যদি ভেবে থাকো আমি আগাগোড়া তোমার সাথে কেবল অভিনয়ই করেছি, তাহলে আমার ওপর অবিচার করা হবে, সত্যিই।' একনাগাড়ে বলে থামল রানা।

সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। কিছু বলল না।

'প্রথমদিকে তোমাদের কোন একজনের নজর কাড়ার জন্যে একটু অভিনয় করেছি ঠিকই,' আবার শুরু করল ও। 'কিন্তু আগাগোড়া সবটাই অভিনয় ছিল না, সায়মা। আমারও তোমাকে ভাল লেগেছে। এখন বরং সে ভাললাগা আরও জোরাল হয়েছে।'

চেহারায় পরিষ্কার অবিশ্বাস ফুটল ওর। কয়েকবার কিছু বলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। কোনমতে শুধু বলল, 'কী বললে?'

'ঠিকই বলেছি,' উঠে পড়ল রানা। 'একটু মাথা খাটালে তুমি নিজেও বুঝতে পারবে। নীলও মেয়ে, সুন্দরী, যুবতী। শুধু নারীদেহই যদি আমার লক্ষ্য হত, তাহলে সে রাতে ওকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম কেন? তোমার কাছে কেন গিয়েছিলাম?'

'আমার টেবিলের কাগজপত্র ঘাঁটতে,' শান্ত কণ্ঠে বলল সায়মা। নির্বিকার।

'অ্যাঁ?' ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল রানা।

'আমি দেখেছি। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ভেবে তুমি ওগুলোয় চোখ বুলিয়েছ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ও। 'হ্যাঁ, বুলিয়েছি। কিন্তু সেটা ছিল হঠাৎ পাওয়া সুযোগ। তুমি কাগজপত্র সব খুলেমেলে বসে আছ, সে কথা ভেতরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত জানতাম না আমি।'

কথা নেই সায়মার মুখে। মনে মনে যুক্তিগুলো নাড়াচাড়া করছে। পায়চারিরত রানার ওপর সেঁটে আছে নজর। 'তুমি তাহলে সত্যিই বাংলাদেশের একজন স্পাই?'

'হ্যাঁ, আমার দেশের বিরুদ্ধে ভয়ানক কিছু পরিকল্পনা করেছে

তমিজউদ্দিন—আমাকে পাঠানো হয়েছে সেটা বানচাল করে দেয়ার জন্যে। কিন্তু এ কথা কে বলল তোমাকে?'

মাথা নাড়ল ও। 'কেউ না। আমি আড়াল থেকে তমিজউদ্দিন আর ইসমাইল উমারকে তোমার ব্যাপারে কথা বলতে শুনেছি।' উঠে এসে রানার দু'হাত ধরল সায়মা। 'রানা, তোমাকে আমি ভুল ভেবেছিলাম। সে জন্যে দুঃখিত, এবং লজ্জিত। মাফ করে দাও।'

মৃদু হাসল ও। 'দিলাম। এখন তাড়াতাড়ি বলো দেখি, তোমাদের ওদিকে কী ঘটেছে? কাল দেখা করতে আসোনি কেন? আজই বা এত দেরি হলো কেন?'

'কী যে ঘটেছে আমি নিজেও জানি না। সেটা যা-ই হোক, আমরা আলেকজান্দ্রিয়ায় পা রাখার পর ঘটেছে। একটা জরুরী মেসেজ নিয়ে তমিজউদ্দিনের জন্যে ঘাটে অপেক্ষা করছিল এক লোক। ওটা পড়ার পর কিছুক্ষণ প্রায় পাগলের মত আচরণ করেছে লোকটা। তারপর আড়ালে ডেকে নীলকে যা-তা বলে গালাগালি করেছে। ও ভয়ে...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! নীল তমিজউদ্দিনকে ভয় করতে যাবে কেন?' বিস্মিত চেহারা হলো রানার।

'করবে না? ওই লোকই তো এখন...' আচমকা ব্রেক কষল সায়মা।

'কী, বলো!'

'এ প্রসঙ্গ থাক, রানা। শুধু এইটুকু শোনো, ওর হুকুমেই আমাকে কাল সারারাত নিজের রূমে আটকে রেখেছে নীল। আজও রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি ওদের সবাইকে শরবতের সাথে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। তাড়াতাড়ি ফিরতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি এসেছি তোমাকে সতর্ক করতে। তোমার ওপর যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ আসতে পারে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' উদ্বিগ্ন দেখাল সায়মাকে। 'তমিজ আর ইসমাইল ঠিক করেছে, ভোর চারটের দিকে আজিজ আর বদিয়াকে এখানে পাঠাবে তোমাকে খুন করতে।'

'এই দুজন কে?'

'নীলের বডিগার্ড। এথেন্সে যে দু'জন তোমাকে...'

'বুঝেছি।' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ইসমাইলের সাথে আসবে ওরা। সে চেক-আউট করার জন্যে আসবে। নিজে ওপরে আসবে না, ওদেরকে পাঠাবে মালপত্র নিয়ে যেতে। এই ফাঁকে তোমাকে...'

'আর বলতে হবে না। খবরটা দেয়ার জন্যে কষ্ট করে এতদূর ছুটে এসেছ বলে ধন্যবাদ।'

ভুরু কোঁচকাল সায়মা, 'শুধু এই জন্যেই আসিনি, বুদ্ধু। সে কাজ তো টেলিফোনেই সারা যেত। আমি এসেছি তোমার সাথে বোঝাপড়া করতে।' হাসল। 'এখনই এখান থেকে সরে পড়ো, রানা। প্লীজ!'

'এত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে? চারটা বাজতে অনেক দেরি আছে।'

'তা হোক, তবু তুমি...'

'সায়মা!' হঠাৎ রানার গলার স্বর বদলে গেল। ভরাট, গম্ভীর হয়ে উঠল। দু'হাতে শক্ত করে ওর দু'কাঁধ আঁকড়ে ধরল। 'আজিজ-বদিয়ার মত লোকের ভয়ে পালিয়ে যাব বলে বাংলাদেশ থেকে এত পথ ছুটে আসিনি আমি। তুমি অনর্থক ভয় পাচ্ছ আমাকে নিয়ে।'

ওর চাউনি দেখে ভয় পেয়ে গেল সায়মা। 'কী করতে চাইছ তুমি, রানা?'

'তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি বাংলোয় ফিরে যাও। তার আগে একটা তথ্য দিয়ে উপকার করে যাও।

তমিজউদ্দিনের নতুন কোনও প্ল্যান আছে? কায়রো ছেড়ে বাইরে কোথাও যাওয়ার?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'ঠিক জানি না। আজ ওদেরকে এ নিয়ে কোনও কথা বলতে শুনিনি। তবে কাল কী সব যেন বলছিল তমিজউদ্দিন। আমি আড়ি পেতে শুনেছি তো, সব কথা শুনতে পাইনি।'

'কী কী শুনেছ, তাই বলো।'

'কী টাইট শেডিউল, ফ্লাইং, ব্লোয়ার, লঞ্চ জার্নি, এইসব বলছিল ওরা বারবার। ও হ্যাঁ, গাড়িতে করে মরুভূমি পাড়ি দেয়ার ব্যাপারেও কী সব বলছিল যেন তমিজউদ্দিন।'

'কখন যাবে, সে ব্যাপারে কিছু?'

'তোমার ব্যবস্থা করা হয়ে গেলে।'

'ধন্যবাদ, সায়মা। তুমি ফিরে যাও এবার। আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। ওরা কিছুই করতে পারবে না আমার।'

করুণ নজরে তাকাল মেয়েটা। 'রানা...!'

ও ঘাবড়ে গেছে বুঝতে পেরে ওকে কাছে টেনে নিল রানা। কিছুক্ষণ চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল। তারপর ঠোঁটে আলতো করে চুমু খেয়ে পিঠ চাপড়ে দিল। 'ঘাবড়িয়ো না। আমি ন্যায়ের পথে আছি; দশটা তমিজউদ্দিনও কিছু করতে পারবে না আমার।'

'একটা কথার জবাব দেবে?'

'কী কথা?'

'ওই লোকটার সাথে তোমার ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে?'

'আমার?' মাথা নাড়ল ও। 'নাহ্! ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা নেই। ও আমার দেশের শত্রু, সায়মা। দেশের তেরো কোটি মানুষের শত্রু। এ নিয়ে পরে কথা হবে। এবার তোমার ফেরা দরকার।'

ঘড়ি দেখল রানা। আড়াইটা বাজে। আর আধ ঘণ্টা পর যাবে

ও তাবাস্‌সুমের ভিলায়। ইচ্ছে করলে এখনই রওনা হতে পারে, অজ্ঞান তমিজউদ্দিনকে হয়তো বন্দীও করতে পারে। কিন্তু তাতে ঝুঁকি আছে। বিপদ দেখলে আত্মহত্যা করে বসতে পারে সে। তাহলে প্লেনটার খোঁজ হয়তো কোনদিনও পাওয়া যাবে না। তাই ওদেরকে অনুসরণ করবে ও হেলিকপ্টারে। আয়োজন পাকা।

'আমি রেডি, রানা।'

'চলো,' বলে আগে আগে এগোল ও। সাবধানে দরজা খুলল, সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়। হিস্‌-হিস্‌ করে মোটা দুই ধারায় গ্যাস ঢুকতে শুরু করল ঘরের মধ্যে। চমকে উঠে শোল্ডার হোলস্টারের দিকে হাত বাড়িয়েছিল রানা, লাফ দিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেছিল।

কিন্তু কোনটাই হলো না। নাকে গ্যাস ঢোকামাত্র হাত-পা অসাড় হয়ে আসায় জায়গামত পৌঁছল না ওর হাত। পিছিয়ে যেতেও ব্যর্থ হলো। সায়মার সাথে জোর ধাক্কা খেয়ে ওকে সহ হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে।

তারপরই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল সবকিছু।

নয়

নাকেমুখে পর পর কয়েকবার জোর পানির ঝাপটা খেয়ে জ্ঞান ফিরে এলো রানার। চোখের পাতা জোরে টিপে মাথা ঝাড়া দিয়ে জমে থাকা পানি ফেলে দিল ও, তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলল।

এক মেলেই চট্ করে বুজে ফেলল আবার জোরাল আলোর কারণে। আবার তাকাল, কিছুক্ষণ চোখ পিট্‌পিট্ করে অভ্যস্ত হয়ে নিল।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে একটু সময় লাগল। নড়তে গেল ও, পারল না। সারা শরীরে ব্যথা। মাথায়ও প্রচণ্ড যন্ত্রণা, মনে হচ্ছে ঘাড় থেকে ছিঁড়ে পড়ে যাবে বুঝি ওটা।

'ঘুম তাহলে ভাঙল?' ওর ডানদিক থেকে ভেসে এলো গলাটা। তমিজউদ্দিনের। 'আর কত ঘুমাবেন, জনাব মাসুদ রানা? উঠুন। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে আমাদের।'

বাঁ হাতে নরম কিছু ঠেকতে অনেক কষ্টে মাথা ঘোরাল ও। সায়মা, চিত হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। ওর নাগালের মধ্যেই। ডান হাঁটু সামান্য উঁচু হয়ে রয়েছে, ডান হাত বুকের ওপর। মাথা ডান দিকে হেলে আছে খানিকটা। চোখ আধবোজা, ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। ধীর লয়ে ওঠানামা করছে বুক। মেঝে পানিতে সয়লাব। পানির ঝাপটায় প্রায় সম্পূর্ণ ভিজে গেছে মেয়েটা, ও নিজেও।

ঘরটার চারদিকে চোখ বুলাল ও। বেশ বড় রুম এটা। এক দেয়ালের সাথে স্তূপ করে রাখা বস্তা দেখল–ময়দার বস্তা। আরও অনেক কিছুই আছে। হয়তো নীলের ভিলার সেলার এটা।

ডানদিকে তাকাল। পাশাপাশি কয়েকটা চেয়ারে বসে আছে তমিজউদ্দিন, ফারুক এবং আরও দু'জন। তাদেরকে এই প্রথম দেখল রানা–দুজনেই বয়স্ক, ষাটের নিচে হবে না কেউ। একজন বেশ মোটাসোটা, গাল ভর্তি চাপদাড়ি। বেশিরভাগই পাকা। বেশ আকর্ষণীয় চেহারা মানুষটার। মুখে মৃদু হাসি লেগেই আছে। খুব সম্ভব এ-দেশী সে

অন্যজনের বয়স একটু কম হবে তার চেয়ে, চওড়ায়ও একটু কম। দেখে বাঙালী মনে হয়। বেশ শক্ত পোক্ত সে। চৌকো

চোয়াল, এরও চাপ দাড়ি। এই লোকের চাউনি প্রথমজনের সম্পূর্ণ উল্টো–চক্‌চকে, বিকারগ্রস্তের মত। লোকগুলোর দু'দিকে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে আজিজ ও বদিয়া। মূর্তির মত। দুই বৃদ্ধের সাথে কিছুক্ষণ নিচু গলায় আরবীতে কথা বলল তমিজউদ্দিন। তারপর ওর দিকে ফিরল।

'জনাব মাসুদ রানা, খুব ইচ্ছে ছিল যাত্রা করার আগে আপনার সাথে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব। ভেতরের ঘটনা বিসিআই কিভাবে জানল, আপনি কী মিশন নিয়ে এতদূর ছুটে এসেছিলেন, এইসব নিয়ে আর কী! কিন্তু হাতে সময় নেই,' মাথা নাড়ল লোকটা। 'আফসোস! এখন খুব তাড়াতাড়ি কাজে নামতে হবে আমাদেরকে। আপনাকেও আমাদের সাথে থাকতে হবে, কারণ ভেবেচিন্তে আপনার জন্যেও একটা কাজ বের করেছি আমি।'

'বুঝেছি,' উঠে বসল রানা। 'তোমাদের কবর খোঁড়ার কাজ তো? তাতে আমার আপত্তি নেই।'

'অ্যাঁ!' হা-হা করে হেসে উঠল তমিজউদ্দিন। 'আপনি তো সাহেব দারুণ রসিক মানুষ! আমি বলতে চাইছি আপনার নিজের কবরের কথা, আর আপনি কী না ভাবছেন উল্টো? নাহ্, আপনার নার্ভ আছে বটে।'

'সবাইকেই তো চিনলাম, কিন্তু এই দুই বেরাদারান?' বয়স্ক দু'জনকে দেখাল ও। 'এরা কারা?'

'এঁরা?' শ্রদ্ধা ফুটল তমিজউদ্দিনের চেহারায়। দ্বিতীয় দাড়িওয়ালাকে দেখাল। ইনি বাংলাদেশ হরকতুল মুজাহেদীন আন্দোলনের সাংগঠনিক কর্মকর্তা জনাব মৌলানা আক্কেল আলি। মিগ হাওয়া করে দেয়ার সমস্ত কৃতিত্বের দাবিদার বলতে পারেন এনাকেই। আর ইনি এদেশের একই সংগঠনের প্রধান সমন্বয়কারী, হাযরাত হাদি আজিয়া।' ইসমাইলের দিকে ফিরল এবার তমিজউদ্দিন। 'আর এ...'

'ইজিপশিয়ান এয়ারফোর্সের এক্স ক্যাপ্টেন, বর্তমানে পলাতক ফারুক হাসনাইন,' রানা বলল।

'আপনি চেনেন দেখছি একে?' হাসল তমিজউদ্দিন। কিন্তু প্রাণ নেই এবারের হাসিতে। ফারুকের চোখেও উদ্বেগ ফুটতে দেখল ও।

'খুব ভাল করে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল। 'শুধু আমি কেন, মিশরীয় সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মাহমুদ বে-ও চেনেন ওকে। যে-কোন মুহূর্তে ওর গর্দানে হাত পড়বে ভদ্রলোকের।'

ফ্যাকাসে হয়ে উঠল ফারুকের চেহারা। বসা অবস্থায়ও তার ভেতরের অস্থিরতা চাপা থাকল না। 'আমি তোমাকে বলেছি, এই লোক শেষ পর্যন্ত...'

চট্ করে হাত তুলে তাকে বাধা দিল তমিজউদ্দিন। 'আপনি ফারুককে কখন চিনেছেন, জনাব রানা?'

'প্রথম যখন জাহাজে দেখি, তখনই সন্দেহ হয়েছিল,' বলল ও। 'কিন্তু দাড়ি নেই বলে চিনতে একটু সময় লেগেছে।'

'মাহমুদ বে? সে কখন চিনেছে?'

'জাহাজ রোডস্ আইল্যান্ডে পৌঁছার পনেরো মিনিটের মধ্যে,' নির্বিকার চেহারায় বলল ও। 'তাঁকে খবরটা দিতেই জাহাজ থেকে নেমেছিলাম আমি।'

'মিথ্যে কথা! তাহলে এতক্ষণ মুক্ত থাকতে পারত না ফারুক। ধরে ফেলত পুলিস।'

জবাব দিতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় সায়মা গুঙিয়ে উঠতে ঘুরে তাকাল। জ্ঞান ফিরেছে ওর, ফ্যালফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ফারুক ব্যস্ত হয়ে কী সব বলছে তমিজউদ্দিনকে, না তাকিয়েও বুঝতে পারল রানা। বেদম ভয় পেয়েছে ব্যাটা। এদিকে ভয় সায়মাও পেয়েছে তমিজউদ্দিনকে দেখে। চেহারা রক্তশূন্য হয়ে উঠেছে।

'জনাব মাসুদ রানা!' ডাকল তমিজউদ্দিন। 'ফারুককে চিনতে পেরেও এতক্ষণ পুলিস অ্যাকশন নেয়নি কেন?'

'আমি বাধা দিয়েছি।'

'কেন?'

'তোমার পিছনে আর কে কে আছে জানা জরুরী ছিল, তাই। একজন দু'জনকে ধরলে বাকিরা সটকে পড়বে। আমি চেয়েছি পালে ছাগল যে ক'টা আছে, একসঙ্গে সব ক'টাকে ধরতে।'

'মিথ্যে কথা বলছে লোকটা,' আক্কেল আলি বলে উঠল চাপা গলায়। 'অযথা আমাদের সময় নষ্ট করছে।'

'ঠিক বলেছেন, হুজুর!' মাথা ঝাঁকাল তমিজউদ্দিন। রানার দিকে ফিরল। 'বে-র অ্যাকশন দেখার সময় নেই আমাদের। অন্য কাজ আছে, চলুন। সায়মা, তোমাকেও যেতে হবে।'

'কোথায়?' ভয়ে ভয়ে বলল ও।

'গেলেই দেখবে,' বাঁকা হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'মানুষ খুন করা জঘন্য গুনাহ্‌র কাজ, ওরকম কিছু করতে চাই না আমি। আবার তোমার মত বেঈমানকে ছেড়ে দেয়াও যায় না। তাই ঠিক করেছি...'

'বা-বা!' হেসে উঠল রানা। 'কী ডায়ালগ! হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে আমার। ভূতের মুখে রামনাম! মৌয়ের মত বাচ্চা একটা মেয়েকে খুন করতে যার বাধল না, শহীদুল্লাহ্‌র মত নির্দোষ একজনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে যার বিবেকদংশন হলো না, সে এখন বলছে এই কথা?'

রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল তমিজউদ্দিনের ফরসা মুখ। 'আমি কাউকে খুন করিনি!'

'অবশ্যই করেছ! প্লেন হাতে পেলে মৌকে ছেড়ে দেবে বলে কথা দিয়েছিলে তোমরা; কিন্তু সে কথা রাখোনি, বেঈমানী করেছ। মৌকে মেরেছ, ওদিকে বোনের মারা যাওয়ার কষ্ট সহ্য

করতে না পেরে ভাইটাও আত্মহত্যা করল। এই দুই খুনের জন্যে তুমিই দায়ী, মুফতি তমিজউদ্দিন। এর মাসুল তোমাদেরকে গুনতেই হবে। দুনিয়ার যে প্রান্তে গিয়েই লুকাও না কেন, নিস্তার নেই।'

অনেক কষ্টে রাগ সামলাল লোকটা। লম্বা দম নিয়ে বলল, 'মৃত্যুকে আমি পরোয়া করি না। আমি যা করছি ইসলামের স্বার্থ রক্ষার জন্যে করছি। তাতে যদি...'

'তোমাদের মত বেআক্কেল আর বেতমিজদের জন্যেই আজ ইসলামের এই দশা। এইসব অর্ধশিক্ষিত কাঠমোল্লা...'

'খামোশ!' চেঁচিয়ে উঠল আক্কেল আলি, উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে থর-থর করে। দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড়। 'তমিজউদ্দিন, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ তুমি। হাত-পা বেঁধে বোটে তোলো এদেরকে।'

'জ্বি, হুজুর। আজিজ, বন্দিয়া, এটাকে বাঁধো আগে। তারপর ওটাকে,' সায়মাকে দেখাল সে।

বিনা বাধায় ওদের দু'জনকে বেঁধে ফেলল লোক দুটো। হাত দুটো পিছমোড়া করে শক্ত করে বাঁধা হলো, কিন্তু পা-দুটোয় একফুট মত নড়াচড়ার ব্যবস্থা রাখা হলো—যাতে ছোট-ছোট পদক্ষেপে হাঁটা যায়, কিন্তু দৌড়ানো না যায়। রানাকে ঠেলতে ঠেলতে বের করে নিয়ে এলো ওরা। সায়মা সবার পিছনে।

কাঁপুনিটা কিসের? দ্বিতীয় দফা জ্ঞান ফিরতে ভাবল রানা। এঞ্জিনের নাকি বোটের দুলুনির?

চোখ মেলে তাকাল ও, কিন্তু নড়ল না। মণি ঘুরিয়ে বুঝল এটা একটা স্টেটরূম। বাঙ্কে শুয়ে আছে ও। রুমটা ছোট, তবে সুন্দর সাজানো-গোছানো। ফার্নিচার যা-যা থাকা দরকার সব আছে। একটা পোর্টহোলও আছে, ওর মধ্যে দিয়ে নীল আকাশ

দেখতে পেল, বাইরে এখন কড়া রোদ। ভেতরে আলো জ্বলছে না—অন্ধকার।

তাবাস্‌সুমের সেলার থেকে বের করে এনে আবারও অজ্ঞান করা হয় ওকে, ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে অবশ্য। কতক্ষণ বা কত ঘণ্টা অজ্ঞান ছিল, সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই রানার। তবে চার-পাঁচ ঘণ্টা যে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কেননা ওরা যখন তাবাস্‌সুমের ভিলা থেকে বের হয়, তখন ছিল শেষ রাত। এখন…হাতঘড়ি দেখতে যাচ্ছিল ও, পাশের বাঙ্কে কাউকে নড়াচড়া করতে দেখে তাকাল। 'সায়মা!'

চমকে উঠে বসল মেয়েটা। 'ওফ্, জ্ঞান ফিরেছে তোমার? আমি…'

'এটা কী ধরনের বোট?' উঠে বসল।

'হাউসবোট। ছয়-সাত ঘণ্টা একনাগাড়ে চলছে।'

'স্রোতের উল্টোদিকে চলছে,' রানা বলল। 'উজানে।'

'বুঝলে কী করে?'

'এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি শক্তি খাটাতে হচ্ছে ওটাকে।'

কান পেতে কিছু সময় শুনল সায়মা। 'তাই তো মনে হচ্ছে! আমরা তাহলে কোনদিকে যাচ্ছি?'

'নীলনদ আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে পড়ে,' বলল ও। 'কিন্তু আমরা যাচ্ছি উল্টো, তার মানে আসওয়ানের দিকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ব্যথায় টন্-টন্ করছে। গায়েও ব্যথা আছে, তবে অনেকটা কম এখন। কাল বোটে তোলার আগে নির্দয় ভাবে পেটানো হয়েছে ওকে। পরনে গতরাতে বাইরে যাওয়ার জন্যে যা-যা পরেছিল, এখনও তাই আছে দেখে খুশি হলো ও। এমনকি জুতো মোজাও স্বস্থানে বহাল আছে। পকেটে

সিগারেটও আছে দেখে তাড়াতাড়ি একটা বের করল ও, তাই দেখে মাথা নাড়ল সায়মা।

'লাভ নেই। তোমার লাইটার নিয়ে গেছে বদিয়া।'

সিগারেট ফেলে দিল ও।

'নীল আছে বোটে?'

মাথা নাড়ল সায়মা। 'ও আর ফারদিন বাংলোয় আছে। গার্ডের পাহারায়।'

'নীল আর তমিজউদ্দিনের সম্পর্কের ব্যাপারটা কী?' প্রশ্ন করল রানা। 'ওরা পরস্পরের লাভার নয়?'

'না। কোনকালে ছিলও না।'

'তাহলে?' বিস্মিত হলো রানা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সায়মা। ভাবল কিছু। 'তমিজউদ্দিন নিজের নোংরা স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে সিন্দবাদের ভূতের মত নীলের ঘাড়ে চেপে বসে আছে গত তিন বছর ধরে।'

'কী স্বার্থ?' মেয়েটা উসখুস করছে দেখে তাড়া লাগাল রানা। 'বলো!'

'ড্রাগসের ব্যবসা আছে তমিজউদ্দিনের। বিরাট স্কেলের। অনেক ডিস্ট্রিবিউটর আছে ওর। নীলকে দিয়েও ওসব বিভিন্ন জায়গায় পাচার করায়।'

কয়েক মুহূর্ত কথা জোগাল না রানার মুখে। ঢাকায় ব্রিফিঙের সময় এ-সম্পর্কে রাহাত খান কী মন্তব্য করেছিলেন, ভাবছে। 'তুমি শিওর?'

মুখ তুলল সায়মা। 'কোন ব্যাপারে?'

'তমিজউদ্দিনের ড্রাগস্ ব্যবসা সম্পর্কে?'

'অবশ্যই! হান্ড্রেড পার সেন্ট।'

'নীল ওকে সাহায্য করে কেন?'

শ্রাগ করল মেয়েটা। 'না করলে ও প্রাণে বাঁচবে না বলে

হুমকি দিয়েছে এ দেশের হরকতুল মুজাহেদীন গোষ্ঠি। প্রচুর ক্ষমতা ওদের। বিরাট সংগঠন। যা খুশি তাই করতে পারে। ওই সার্কেলে তমিজউদ্দিনের ভীষণ প্রভাব। ওরাই তার হয়ে চাপের মুখে রাখে ওকে। কাজ না করে উপায় নেই। শুধু নীল নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনপ্রিয় অনেকেরই ঘাড়ে সওয়ার হয়ে এই কাজ করে ওরা। মাফিয়ার মত।'

একটু পর আবার বলল ও, 'নীলের দোষ হোক ভুল হোক, একটাই হয়েছিল। তমিজউদ্দিনের কাছ থেকে ড্রাগস কিনেছিল ও এক বন্ধুর জন্যে। গত তিন বছর ধরে সেই ভুলের মাসুল গুনছে।'

'কিন্তু ওকে দেখে তো তা মনে হয় না।' রানা বলল। 'বরং মনে হয় আনন্দেই আছে। দু'হাতে টাকা ওড়াচ্ছে ঘুরে বেড়ানো আর কেনাকাটার পিছনে। ইচ্ছেমত...'

'সেসব ও করছে নিজের ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে, আমি জানি। এর হাত থেকে জীবনে মুক্তি নেই বুঝতে পেরে নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কিছুদিন থেকে নিজেও ড্রাগস্ ধরেছে। বহু বুঝিয়েছি, কাজ হয়নি।'

'বুঝলাম,' অনেকক্ষণ পর বলল রানা। অন্যমনস্ক। 'কিন্তু এদেশী হরকতুল মুজাহেদীনরা ড্রাগস্ ব্যবসার দিকে ঝুঁকল কেন?'

'সোজা কারণ,' সায়মা বলল। 'অতিরিক্ত গোঁড়ামির জন্যে আজকাল মানুষ ওদের ফান্ডে তেমন কন্ট্রিবিউট করে না। তাই রোজগারের এই সহজ পথ ধরেছে।'

'তমিজউদ্দিনের কিসের ব্যবসা?'

'মেইনলি হেরোইনের। সঙ্গে আফিম আর গাঁজাও আছে।'

'কোত্থেকে আসে এসব?' বলল রানা।

'আগে আসত দুনিয়ার সবচে' "ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের" দেশ আফগানিস্তান থেকে,' চোখ পাকাল সায়মা। 'এখন আসে কিছু

পাকিস্তান আর কিছু গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল থেকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। বোঝা গেল এত টাকা কোত্থেকে পায় তমিজুদ্দিন। ড্রাগ বেচে ধর্মরক্ষার চেষ্টা করছে। আর ধর্ম বেচে দখল করার চেষ্টা করছে শাসনক্ষমতা, গদি।

পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকাল সায়মা। 'কিন্তু বাংলাদেশে কী ঘটিয়ে এসেছে ও? প্লেন নিয়ে কী যেন বলছিলে তখন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা।

আঁধার হয়ে আসছে। এর মধ্যে কেউ আসেনি স্টেটরুমে। হাউসবোট চলছে তো চলছেই।

'ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের?' সামনের বাঙ্ক থেকে জানতে চাইল সায়মা। হাতের ওপর মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে আছে ও।

'প্লেনটার কাছে,' রানা বলল চিন্তা-ভাবনা না করেই।

'কেন? ওটার কাছে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার?'

সায়মার দিকে তাকাল রানা। ঘুমের অভাবে চোখ লাল, গর্তে বসে গেছে। চেহারায় উদ্বেগ। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ভাবল রানা। কেন ওদেরকে প্লেনের কাছে নিয়ে যাচ্ছে ব্যাটারা? এত ঝুঁকি কেন নিচ্ছে? মেরেই যদি ফেলতে হয়, পায়ে ভারী কিছু বেঁধে নদীতে ফেলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! নীলনদই ওদের ব্যবস্থা করতে পারে। তাহলে?

'নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে,' ভেতরে সন্দেহ চেপে রেখে বলল। 'মনে হয়...'

আচমকা বোটের বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

ক্রমে বাড়ছে কাঁপুনি। বাঙ্কের কিনারা আঁকড়ে ধরে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেদেরকে ঠেকাল ওরা।

'কী হচ্ছে?' ভীত গলায় বলল সায়মা।

'রিভার্স করছে এঞ্জিন, বোট থামছে।' স্টার্ন স্টারবোর্ড সাইডের দিকে ঘুরে যাচ্ছে বুঝল ও। 'তোমার কমপ্যাক্ট আছে?'

'আছে, কেন?' বলতে বলতে হাতব্যাগ থেকে জিনিসটা বের করে দিল মেয়েটা। 'কী করবে?'

জবাব দিল না রানা। ওটা খুলে ছোট্ট পোর্টহোল দিয়ে বের করে দিয়ে চোখ রাখল খুদে আয়নাটায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল। বোট থেমে পড়েছে, এঞ্জিন মৃদু, গুড়-গুড় গুড়-গুড় অলস আওয়াজ করছে। আয়না আরও কয়েকবার এদিক-ওদিক ঘোরাতেই নদীর উঁচু পাড় দেখতে পেল রানা। বোট বাঁধার লাইন হাতে দুই ক্রুকে কাদা ভেঙে পাড়ে উঠে যেতে দেখল। কাজ সেরে রাইফেল কাঁধে নিয়ে প্রায় মার্চ করার ভঙ্গিতে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। আঁধার জেঁকে বসায় লোকগুলোর চেহারা দেখা গেল না।

স্টার্নের দিক থেকে একাধিক মানুষের গলা শুনতে পেল ও, কিন্তু কী বলছে বুঝতে পারল না অনেক চেষ্টা করেও। জড়ানো কণ্ঠের অর্থহীন ভ্যাজর-ভ্যাজর মনে হলো। একটু পর স্টেটরুমের হ্যাচের বাইরে কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ উঠল। কমপ্যাক্ট পকেটে রেখে অপেক্ষায় থাকল ও।

সশব্দে খুলে গেল হ্যাচওয়ে। তমিজউদ্দিনকে দেখা গেল সেখানে। কাঁধে ঝুলছে একটা মেশিন পিস্তল। দীর্ঘদেহী, ঠাণ্ডা, আত্মবিশ্বাসী। তার পাশ ঘেঁষে ভেতরে ঢুকল আজিজ ও বদিয়া, ওদের দু'জনের হাতেও মেশিন পিস্তল। পিছনে আক্কেল আলিকে দেখতে পেল রানা, তার পাশে ফারুক। তার কাঁধেও একই অস্ত্র।

'হ্যালো, মাসুদ রানা!' হাসল তমিজউদ্দিন। 'কেমন কাটল সময়?'

'এটা কোন্ জায়গা?' জানতে চাইল রানা।

'আবু সিমবেলের একটু দক্ষিণে,' দাঁত বের করে হাসল

তমিজ। 'সুদানী বর্ডার থেকে সামান্য দূরে। তোমার মাহমুদ বে-র নাগালের বেশ বাইরেই বলতে পারো। এসো। বের হও।'

প্যাসেজওয়ে ধরে আগে আগে চলল সে আর আক্কেল আলি। তাদের পিছনে থাকল রানা ও সায়মা। আজিজ ও বদিয়া পিছনে, সতর্ক। সবশেষে ফারুক। ল্যাডার বেয়ে একজন একজন করে মেইন ডেকে উঠে এলো সবাই। সাথে সাথে নাকেমুখে ঝাপ্টা মারল মরুর ঠাণ্ডা বাতাস।

চোখ কুঁচকে সামনে তাকাল রানা। দেখল আক্কেল আলি গ্যাঙওয়েয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওদের অপেক্ষায়। রানার গায়ের সাথে প্রায় লেগে আছে সায়মা। মেয়েটা ভয়ে কাঁপছে, স্পষ্ট টের পাচ্ছে ও। ওকে অভয় দেয়ার জন্যে ঘুরে তাকাল রানা, চাপা গলায় বলল, 'মনে সাহস রাখো। শেষ পর্যন্ত...' আর এগোতে পারল না।

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েই হাত চালাল ক্রুদ্ধ তমিজউদ্দিন। রানার গালে লাগল ভয়ঙ্কর চড়টা, রাইফেলের গুলি ফোটার মত বিকট আওয়াজ উঠল। আঘাত সামলে ওঠার সুযোগ দিল না লোকটা, আবার চড় মারল। মাথা ঘুরে উঠল রানার, পড়ে যেতে যেতেও অনেক কষ্টে সামলাল নিজেকে।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল, আবারও মারল লোকটা। মাথা পিছনদিকে ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকি খেল ওর, ঠাস্ করে বাড়ি খেল হুইলহাউসের দেয়ালে। নিজেকে সিধে করার আগেই রানা বুঝল ওপরের ঠোঁট কেটে গেছে, খানিকটা রক্ত মুখের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। 'থুক' করে একদলা রক্ত ফেলল ও। রক্ত হিম করা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এজন্যে পস্তাতে হবে তোমাকে বেতমিজ!'

আবার মারল সে। এবার দুই চোখের মাঝখানে প্রচণ্ড এক ঘুষি। সামলাতে না পেরে দু'তিন 'পা পিছিয়ে গেল রানা। এর মধ্যেও লোকটার অবিশ্বাস্য রিফ্লেক্স আর মারের ওজন বিস্মিত

করল রানাকে। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের সামনে ভাসমান সর্ষেফুল দূর করার চেষ্টা করতে লাগল।

ওকে কিছুটা সামলে উঠতে দেখে অমায়িক হাসি হাসল তমিজউদ্দিন। শান্ত, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে এখানে, এই মুহূর্তে খতম করে দিতে পারলে মওলানা আক্কেল আলি খুব খুশি হবেন, মাসুদ রানা। পিছনে চেয়ে দেখো আজিজ আর বদিয়ার আঙুল ট্রিগারে চাপ দেয়ার জন্যে কেমন নিশপিশ করছে। কিন্তু আমরা তা চাই না। আমরা চাই যেন তুমি এতদূর ছুটে আসার জন্যে উপযুক্ত পুরস্কার পাও। তোমাকে নিয়ে বিশেষ এক প্ল্যান...'

'হয়েছে!' কড়া দাবড়ি লাগাল আক্কেল আলি। 'থামুন! নিয়ে যান ওদের!'

সাথে সাথে সুবোধ বালক বনে গেল তমিজ। মাথা ঝাঁকাল, 'জ্বি, জ্বি! যাচ্ছি। ফারুক, চলে এসো।'

রানার পাশ ঘেঁষে গ্যাঙওয়ের দিকে এগোল ছোটখাট মানুষটা। চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ, চেষ্টা করেও চেপে রাখতে পারছে না।

'আসুন, জনাব মাসুদ রানা,' একেবারে স্বাভাবিক গলায় বলল তমিজউদ্দিন। সম্বোধন বদলে ফেলেছে আবার। 'হাঁটুন,' গ্যাঙওয়ে দেখাল ইঙ্গিতে। 'সায়মা, এগোও।'

তীরে এনে আবার ওদের পিছমোড়া করে বাঁধা হলো। কাজটা শেষ হতে রানার পিঠে খোঁচা মারল তমিজউদ্দিন। 'হাঁটুন।'

ধুলোমোড়া একটা কাঁচা রাস্তা ধরে দূরে অপেক্ষমাণ একটা ট্রাকের দিকে এগোল দলটা। আক্কেল আলি আর তমিজউদ্দিন উঠল সামনে। রানা আর সায়মাকে নিয়ে অন্যরা পিছনে উঠল। বড় একটা কাঠের বাক্স দেখল রানা ট্রাকের পিছনে। এছাড়া বড় দুটো ত্রিপলসহ আরও কী কী রয়েছে। বাক্সটায় হেলান দিয়ে

পাশাপাশি বসল ওরা দু'জন। বদিয়া আর আজিজ ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে দিল ক্যারিয়ার।

সগর্জনে স্টার্ট নিল ট্রাক। নাচতে নাচতে রওনা হলো অজ্ঞাত গন্তব্যের উদ্দেশে।

দশ

অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে ট্রাক। তার মধ্যেও খানিকপর ঢুলতে শুরু করল মাসুদ রানা। চোখ টেনেও খুলে রাখতে পারছে না ও, আপনা আপনি বুজে আসছে। এক সময় সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল। ওর দেখাদেখি সায়মাও। এছাড়া করার কিছু নেইও। একে দু'হাত পিছনে কষে বাঁধা, তারওপর বাইরে সাহারা মরুভূমি। যদি গার্ডদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তা হবে মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আনা।

ক্যানভাস দেয়ালের ফাঁক ফোকর দিয়ে ঊষা আত্মপ্রকাশ করল যথাসময়ে। মরুভূমিতে যা হয়ে থাকে, সূর্য ওঠামাত্র গরমে তেতে উঠল ভেতরটা। তবে ওদের জন্যে ব্যাপারটা আশীর্বাদ হয়ে উঠল, কেন না রাতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ফলে প্রায় জমে গিয়েছিল প্রত্যেকে। একটু পর বদিয়া উঠে তিনদিকেরই ফ্ল্যাপ তুলে দিল।

বাক্সের গায়ে হেলান দিয়ে বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে আধশোয়া হয়ে ছিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে বাইরের দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির দিকে তাকাল। ঘুম-ঘুম ভাব উধাও হয়ে গেছে মুহূর্তে। সূর্যের

অবস্থান দেখে ওর মনে হলো দক্ষিণ-পশ্চিমে চলেছে ট্রাক। রাতের কোন এক সময় বর্ডার অতিক্রম করে এসে ওরা।

ঢেউয়ের মত বিছিয়ে থাকা বালির সাগর পার হচ্ছে এ মুহূর্তে। যতদূর দেখা যায় ছোট ছোট বালিয়াড়ি। সম্ভবত বিশাল খাবির মরুভূমির পুবে রয়েছে এখন ওরা, রানা ভাবল। তা হলে সামনেই রয়েছে এদিকের একমাত্র মরুদ্যান—সেলিমা।

যদিও সবই অনুমান। ডিটেইলড্ টপোগ্রাফিক চার্ট ছাড়া মরুভূমিতে কোন কিছুই নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। সে চেষ্টাই হাস্যকর। তবু ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দিল না ও। হঠাৎ করে ট্রাকের নাক উঁচু হলো অনেকটা, ওই অবস্থায়ই কিছুক্ষণ চলল, তারপর ঝপ্ করে নেমে গেল, গতি বেড়ে গেল ট্রাকের। একটু পরই বিশাল এক ওয়াদির মধ্যে নেমে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সামনে থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল তমিজউদ্দিন। পিছনে উঁকি দিয়ে রানার সাথে চোখাচোখি হতে হাসল মৃদু। 'নামুন। দিনটা এখানেই কাটাতে হবে।'

'পথ আরও বাকি আছে?' স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করল ও।

'বাকি আছে মানে? সবে তো মাত্র অর্ধেক পথ পেরিয়েছি।'

ত্রিপল নামানো হলো ট্রাক থেকে, তাঁবু খাটানো হলো। আগুন জ্বালা হলো রান্নার জন্যে সব কাজ বলতে গেলে আজিজ আর বদিয়াই করল। এত দক্ষ হাতে ও দ্রুততার সাথে করল যে ওরা যে খাস বেদুইন, তাতে কোন সন্দেহই রইল না রানার।

প্রাথমিক কাজ সেরে ক্যাবের ছাদে রাখা এক খাঁচা থেকে একটা নধর বাচ্চা-খাসী নামিয়ে জবাই করল ওরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোস্টের মিষ্টি সুবাসে ভরে উঠল বাতাস। খিদে! পেটের মধ্যে ভীষণভাবে মুচড়ে উঠল রানার। মনে পড়ল, চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি হয়ে গেছে পেটে কিছু পড়েনি।

খাবার পরিবেশন করা হতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত খেল রানা। সায়মাও তাই করল। রোস্ট, শুকনো পিঠা রুটি ও কড়া মিষ্টি দেয়া কফি দিয়ে খাওয়া সারল সবাই। পেট ঠাণ্ডা হতে গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তাঁবুতে আশ্রয় নিল একে একে। তমিজউদ্দিনকে ওর কয়েক হাত দূরে বসে পড়তে দেখে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল রানা।

'প্লেনটা তো দখল করেছ,' বলল ও। 'এখন ওটা দিয়ে কী করার কথা ভাবছ?'

'ভাবছি না,' হেসে মাথা নাড়ল সে। 'ভাবনা-চিন্তা আগেই সারা হয়ে গেছে। এখন কাজ।'

'সেটাই তো জানতে চাইছি। কী কাজ?'

'সময় হলে নিজের চোখেই দেখতে পাবে, মাসুদ রানা। একটা সময়ে ওটার গানার-নেভিগেটরের সীটে থাকবে তুমিই।'

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে লোকটাকে মাপল ও। মৌলানা আক্কেল আলিকেও দেখল। ওদের কয়েক গজ দূরে বিছানো পুরু কার্পেটের ওপর কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে সে। তমিজউদ্দিনকে বাধা দেয়ার কোন আভাস নেই চেহারায়, বরং মনে হলো অনুমোদনই করছে সে, তমিজের মুখে শুনে শেষ মুহূর্তে গোটা ব্যাপারটা আর একবার খতিয়ে দেখতে তার ভালই লাগবে।

'করতে হবে কী আমাকে?' বলল রানা।

'তোমাকে? না, তোমাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না,' মাথা নাড়ল সে আবার। 'তুমি শুধু ঘটনার সাক্ষী থাকবে। তারপর, ক্যাপ্টেন ফারুকের কাজ শেষ হলে সে বেইল আউট করবে, আর তুমি সোজা,' হাত দিয়ে গোত্তা খাওয়ার ভঙ্গি করে দেখাল, 'ভিড়িম!'

'আচ্ছা! তা এই "ভিড়িম"টা কোথায় ঘটবে?'

'ঢাকায়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওপর।' দাঁত বেরিয়ে পড়ল তমিজউদ্দিনের। 'অধিবেশন যখন চলছে, তখন।'

মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের শীতল একটা ধারা বয়ে গেল ওর। ঘাড়ের খাটো চুলগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল। 'ক্র্যাশ করানো হবে মিগ?'

'বাহ্, বেশ বুদ্ধি রাখো দেখছি তুমি! হ্যাঁ, ক্র্যাশ করানো হবে। আজ মালাউনদের মাথায় কিছু বোমা-টোমা ফেলার পর। আগামীকাল ধরা হবে জাতীয় সংসদকে।'

চুপ করে থাকল ও। সায়মা একটু দূরে বসেছে, তাকিয়ে আছে তমিজউদ্দিনের মুখের দিকে। মাঝেমধ্যে রানার দিকেও তাকাচ্ছে ওর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে। বাংলায় কথা হচ্ছে বলে বুঝতে পারছে না কিছুই। কিন্তু ওদের দুজনকে, বিশেষ করে রানাকে দেখে আন্দাজ করতে পারছে খোশগল্প করছে না ওরা। গুরুগম্ভীর বিষয়। অস্বস্তিতে পড়ে গেল মেয়েটা।

'হঠাৎ হিন্দুদের মাথায় বোমা ফেলার প্রয়োজন কেন পড়ল?' বলল রানা। 'তোমাদের কী ক্ষতি করেছে ওরা?'

মাথা নাড়ল তমিজউদ্দিন। 'কোন ক্ষতি করেনি।'

'তাহলে কেন এই অহেতুক গণহত্যা...'

'অহেতুক কে বলল তোমাকে?' মৃদু হাসল সে। 'বাংলাদেশের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যে কাজটা করতে যাচ্ছি আমরা।'

'আরেক দেশে বোমা মেরে নিজ দেশের ভবিষ্যৎ...'

'একই সাথে ইসলামের সেবা করাও আমাদের লক্ষ্য,' বাধা দিয়ে বলল তমিজুদ্দিন। তারপর ব্যাখ্যা দিল। 'আমাদের টার্গেট বাংলাদেশের সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী এবং বিরোধীদলীয় রাজনীতিক। এ টু জেড! এরাই মিথ্যা ভাঁওতা দিয়ে আমাদের মাথার ওপর চড়ে বসে সুশাসনের নামে নিজেরা লুটপাট, কামড়া-কামড়ি, চুলোচুলি করছে, আর সর্বনাশ করছে দেশবাসীর। সমস্ত

দুর্নীতি, সমস্ত সন্ত্রাসের মূল হোতা এরাই। এদেরকে একসঙ্গে পেতে হলে জরুরী সংসদ অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানেই আসছে ভারত।'

'কীভাবে?'

'প্রথম দিন আমরা ভীমরুলের চাকে ঢিল দেব। বাংলাদেশের পশ্চিম বর্ডারের কাছাকাছি কয়েকটা শহরে গোটা কয়েক বোমা ফেলে ফিরে আসবে মিগ-২৯। ফলে এমনই তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠবে, এমনই হৈ-হুলুস্থুল শুরু হয়ে যাবে, এমনই চাপ আসবে চারদিক থেকে যে পরদিন জাতীয় সংসদের জরুরী অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হবে বাংলাদেশ সরকার।' খিক-খিক করে হাসল তমিজউদ্দিন। 'সেই সুযোগটাই নেব আমরা। ঢাকা থেকে খবর পেলেই রওনা হয়ে যাবে মিগ, ধুলোয় মিশিয়ে দেব আমরা গোটা সংসদ ভবন। কে করল কাজটা? না, হরকতুল মুজাহেদীন তো নয়ই, ধর্মান্ধ ইসলামী মৌলবাদীদেরও কেউ নয়, মাথা বিগড়ে যাওয়া প্রতিশোধপরায়ণ এক সরকারী এজেন্ট—মাসুদ রানা।'

'এতেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে?'

'না। আমরা গত পঞ্চান্ন বছর ধরে দেশের প্রতিটা অঞ্চলের গ্রামে-গঞ্জে-শহরে মাহফিল ও মসজিদের মাধ্যমে গ্রাউন্ডওয়ার্ক করেছি। গডফাদারগুলো শেষ হয়ে গেলে আবার তৃণমূল থেকে গড়ে উঠবে নেতৃত্ব। ধর্মবিশ্বাসী, সৎ লোক সুযোগ পাবে রাষ্ট্র পরিচালনার।'

ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল রানা। 'আফগান তালেবানদের মত? যারা কয়েক বছরের মধ্যে একশো বছর পিছিয়ে নিয়ে গেছিল আফগানিস্তানকে?'

কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল তমিজউদ্দিন। তারপর দৃঢ়স্বরে বলল, 'কিছু অর্জন করতে হলে কিছু বর্জনও করতে হয়, মাসুদ রানা। পশ্চিমারা ইসলামের উত্থানকে কোনদিন ভাল চোখে

দেখেনি। পৃথিবীর যেখানেই মুসলমানরা সংগঠিত হতে চেষ্টা করেছে, ওদের ইচ্ছেমত চলতে অস্বীকার করেছে, তার সবখানেই এই রকম "পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া" দেখেছে ওরা, বিশ্ববাসীকেও তাই দেখিয়েছে। মুসলমানের সন্তান হয়েও তোমরা তা বিশ্বাস করেছ। কিন্তু ইরানের দিকে তাকিয়ে দেখো, সিআই-এর দালাল রেজা শাহ্‌কে উৎখাত করার পর "ইরান গেছে" বলে চেঁচিয়েছিল পশ্চিমারা। ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, মোল্লাদের হাতে পড়ে দেশটা খতম হয়ে যাবে। এখন কী দেখছ, শেষ হয়ে গেছে? হয়নি। বরং বহুগুণ উন্নত আর সমৃদ্ধ হয়েছে। এই কৃতিত্ব কাদের? ওই সব ধর্মবিশ্বাসীদের। সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যে ইরানকে কঠোর হতে হয়েছে, প্রচুর জঞ্জাল সাফ করতে হয়েছে।

'আফগানিস্তানেও সেই পর্ব চলছিল। দেখতে দেখতে ওই দেশটাও একদিন দ্বিতীয় ইরান হয়ে উঠত। কিন্তু সহ্য হলো না পশ্চিমা খ্রিস্টানদের। বিনা প্ররোচনায় আল কায়েদার ছুতো ধরে খুন করল ওরা আফগানিস্তানের হাজার হাজার নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, সাধারণ মানুষকে; উৎখাত করল সরকার, ধ্বংস করে দিল দেশটা।'

'এবার বাংলাদেশকে আরেক আফগানিস্তান বানানো দরকার তোমাদের নেতৃত্বে। এই তো?'

ও ঠাট্টা করছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল তমিজউদ্দিন। 'হ্যাঁ। ইনশাল্লাহ্। কিছু করতে হলে আগে দেশের ক্ষমতায় বসতে হবে আমাদেরকে, মাসুদ রানা,' মৌলানাকে দ্রুত এক পলক দেখে নিল তমিজউদ্দিন।

'বলতে পারেন,' মাথা নেড়ে হাই তুলল লোকটা 'এখন বললে ক্ষতি নেই। তবে শেষটুকু বাদে অবশ্যই।'

রানার দিকে ফিরল তমিজ।

'দেশের সমস্ত কী পয়েন্টে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষায় আছে

আমাদের লোক। কত লোক তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। বর্তমান দুর্নীতিপরায়ণ নেতৃত্ব যখন ঝাড়েবংশে শেষ হয়ে যাবে, দু'চারজন সংসদের বাইরে থাকলে তাদের, এবং পাতি-নেতাগুলোকে ধরে ধরে জবাই করা হবে।'

'তারপর তোমরা গিয়ে উঠে বসবে গদিতে, কেমন?' হাসল মাসুদ রানা। 'এতই সোজা?'

'কঠিনটা কোথায়?' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল তমিজউদ্দিন। 'নেতৃত্ব দেয়ার মত আর কোনও মানুষ থাকলে তো!'

আপনা থেকেই আক্কেল আলির দিকে চোখ গেল রানার। ওর মনের অবস্থা টের পেয়ে মিটিমিটি হাসছে লোকটা, দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে। ইচ্ছে হলো, এক ঘুসিতে ওর নাক-মুখ ভর্তা করে দেয়, কিন্তু উপায় নেই। হাত বাঁধা। তাঁবুর প্রবেশ পথের কাছে খসখস আওয়াজ উঠতে ঘুরে তাকাল ও। দেখল একটা ফ্লাইট ব্যাগ হাতে ভেতরে এসে দাঁড়াল ফারুক হাসনাইন। ওটা রানার সামনে ঝপ্ করে ফেলল সে। 'উঠুন। ড্রেস-আপ্ করতে হবে।'

'আজিজ,' ডাকল তমিজউদ্দিন। 'এর বাঁধন খোলো।'

হাত মুক্ত হতে উঠে কব্জি ডলতে লাগল রানা। এরমধ্যে ব্যাগ খুলে ফ্লাইট কভারলস্ বের করে ফেলেছে ফারুক। 'নিন্, পরে ফেলুন। শুনেছি, আসার আগে ঢাকায় মিগ-২৯ ওড়ানোর ট্রেনিং নিয়েছেন আপনি, সত্যি?' হাসল।

লাফিয়ে পড়ে হারামজাদার ঘাড় মটকে দেয়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করতে হলো ওকে। মেশিন পিস্তল হাতে কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই ষণ্ডা, কিছু করার উপায় নেই। কভারলস্ পরার ফাঁকে খোলা ফ্লাইট ব্যাগটার ভেতরে চোখ গেল ওর। নিজের ওয়ালথারটা দেখল ওখানে। পাশে একটা ক্লিপ। চেম্বার থেকে বের করা ওটা। এক্সট্রা ক্লিপটা গেল কোথায়? ভাবল রানা।

'ওগুলো? সুভেনিয়ার হিসেবে রেখে দিতে চাইছ বুঝি?'

ওর প্রশ্নের জবাবে ঘোঁৎ করে উঠল ফারুক। 'একদম উল্টো। সময়মত আপনার সাথেই পাওয়া যাবে ওগুলো।'

কভারলস্ পরা শেষ হতে ওটার বুকের বাঁ দিকের ইনসিগনিয়া প্যাচটা দেখল রানা। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রতীকের ওপরে লেখা 'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত'।

'একটু টাইট ফিট্ হয়েছে,' তমিজউদ্দিন বলল। 'তবে কাজ চলে যাবে।'

'খুলে ফেলুন এখন,' ফারুক বলল।

একটু পর আবার হাত বাঁধা হলো ওর। তমিজউদ্দিন বলল, 'যান, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিন,' সায়মাকে দেখিয়ে এক চোখ টিপল।

ওর পাশে গিয়ে বসল রানা। হেসে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু হলো না। 'এসব কী হচ্ছে, রানা? ওরা কী করতে যাচ্ছে?'

এড়িয়ে গেল ও। 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এখন কী হবে?' গলা কেঁপে গেল সায়মার। 'ওদের ভাবভঙ্গি একটুও সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'ঘাবড়িয়ো না,' নিচু গলায় সান্ত্বনা দিল ও। 'আমরা ন্যায়ের পক্ষে আছি। শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতব, দেখে নিয়ো।'

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল সায়মা। 'আমার তা মনে হয় না, রানা।'

'সময় হোক। দেখতে পাবে।'

সায়মাকে নিয়ে তমিজউদ্দিনের কী পরিকল্পনা আছে? ভাবল ও। ওকে কেন নিয়ে আসা হয়েছে এখানে?

২

সূর্য ডুবে যেতে রাতের খাবার খেয়ে নিল দলের সবাই, দেরি না করে তখনই রওনা হলো ট্রাক। অসীম বালির সমুদ্র পাড়ি দিতে

শুরু করল হেলেদুলে, ঝাঁকি খেতে খেতে।

কানে সায়মার গরম নিঃশ্বাস পেয়ে ঘুরে তাকাল রানা। 'কোনমতে পালিয়ে যেতে পারি না আমরা? ট্রাক থেকে...'

'উঁহুঁ। এদের সাথেই থাকতে হবে এখন আমাদের। তাহলে প্রাণে বাঁচা যায় কি না, চেষ্টা করে দেখার একটা সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে,' রানা বলল। 'কিন্তু পালিয়ে গেলে...,' থেমে থুতনি উঁচু করে বাইরের দিকে ইঙ্গিত করল। 'এর হাত থেকে পালাবে কোথায় তুমি?'

সামনে তাকাল মেয়েটা। চাঁদের আলোয় যতদূর চোখ যায়, শুধু বালি আর ছোটখাট ঝোপঝাড়ের মহাসমুদ্র ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কোথায় তার শুরু, কোথায় শেষ, কে জানে! বহুক্ষণ চলে ট্রাক থেমে দাঁড়াল।

রানার হাতঘড়ি খুলে নেয়া হয়েছে, সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। তবু চাঁদের অবস্থান দেখে মোটামুটি আন্দাজ করে নিল, ভোর তিনটের মত হবে এখন। ফ্ল্যাপ সরিয়ে হাঁক ছাড়ল তমিজউদ্দিন। 'নামো সবাই। হারি আপ।'

হুড়মুড় করে নেমে গেল তার লোকজন, ওদের প্রতি একের পর এক হুকুম জারি করতে লাগল তমিজউদ্দিন। নিস্তব্ধ মরুভূমিতে অকিঞ্চিৎকর লাগছে তার চড়া কণ্ঠ। রানা ও সায়মাও নামল। পায়ের নিচে কঠিন বালি টের পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা। দেখতে পেল আরেক প্রশস্ত ওয়াদির মধ্যে রয়েছে এখন ওরা। যথেষ্ট গভীর এটা। দুই দিকে প্রায় ষাট-সত্তর ফুট উঁচু বালিয়াড়ি। পায়ের নিচে ওয়াদির মেঝে পাথরের মত শক্ত, সমতল।

ওয়াদির খোলামুখের কাছে পাঁচটা প্রকাণ্ড কাঁটা ঝোপ এবং একটা দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াদির মেঝেতে ছড়িয়ে আছে উটের লাদা ও স্কেলিটন। চামড়াওয়ালা। মরুভূমির শুকনো গরম

বাতাসে আপনা-আপনি মমিতে পরিণত হয়েছে ওগুলো। অতীতে জায়গাটা নিশ্চয়ই কোন মরুদ্যান ছিল, ভাবল রানা।

ওদের দুজনকে একটা কাঁটা গাছের সাথে বেঁধে রেখে ট্রাকের পিছনের কাঠের বাক্সটা নামাল দুই ষণ্ডা। তার ভেতর থেকে বের হলো তিনটে গ্যাসোলিনচালিত ব্লোয়ার।

'ওগুলো দিয়ে কী হবে?' প্রশ্ন করল সায়মা।

'বালি উড়িয়ে প্লেন উদ্ধার করা হবে,' কোনরকম চিন্তাভাবনা না করেই বলল রানা।

কথা শেষ হয়নি ওর, তার আগেই তিন ব্লোয়ার গর্জন করে উঠল একযোগে। বদিয়া, আজিজ ও ট্রাক ড্রাইভার ওগুলো চালাচ্ছে, তমিজউদ্দিন আর ফারুক তদারক করছে তাদের কাজ। ডানদিকের বলিয়াড়ির গোড়া থেকে বালি ওড়ানো হচ্ছে। বেশিক্ষণ লাগল না, সামনের আড়াল সরে যেতেই প্লেক্সিগ্লাসের একটা প্রকাণ্ড বল দেখা দিল। ওটার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে যার জন্যে এতকিছু, সেই মিগ-২৯। জোরাল চাঁদের আলোয় অদ্ভুত লাগছে ওটাকে। চকচক করছে নাক থেকে লেজ পর্যন্ত।

রানা মুখে কিছু বলল না, তবে আস্ত একটা প্লেন লুকিয়ে রাখার এমন উপযুক্ত জায়গা আবিষ্কার করায় মনে মনে তমিজউদ্দিনের বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না। বলটার দিকে তাকিয়ে থাকল। বাতাস ভরে ফোলানো হয়েছে ওটাকে, সেই সাথে ভেতরে কাঠের পিলার এবং বীম দিয়ে বালির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থাও আছে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগল বলটাকে পুরোপুরি মুক্ত করতে। তারপর মুক্ত করা হলো প্লেনটাকে। কাজ শেষ হতে ফারুকের দিকে ফিরল তমিজউদ্দিন। 'আর দু'ঘণ্টা আছে ভোর হতে। চেক্ করে নাও সব। সময় নেই।'

কথা বলতে বলতে প্লেনটার দিকে চলল লোক দুটো। পাঁচ

মিনিট পর রানা ও সায়মাকে হতভম্ব করে দিয়ে সগর্জনে স্টার্ট নিল মিগ, একটু পর আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এল। ধীরগতিতে ওদের দিকে আসছে। কাঁটা গাছগুলোর দশ গজের মধ্যে এসে ঘুরল। পুরো ঘুরে ওমুখো হওয়ার আগে ককপিট থেকে রানার উদ্দেশে হাত নাড়ল ক্যাপ্টেন ফারুক। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল রানা–ব্যাটার মতলব বুঝতে পারছে না।

উড়তে যাচ্ছে? একা? ওয়াদি বেডের দিকে তাকাল। পাথরের মত শক্ত, প্রায় সমতল কয়েকশো গজের সরু এক ফালি রাস্তার মত। মিগের ওঠা-নামার জন্যে যথেষ্ট।

রানার আশঙ্কাই সত্যি হলো। 'রানওয়ের' দু'দিকে, আগে থেকেই মশাল পোঁতা ছিল, খেয়াল করেনিও আগে। ওগুলো জ্বেলে দিল তমিজউদ্দিনের সঙ্গীরা, কান ফাটানো আওয়াজের সাথে ওর মধ্যে দিয়ে দৌড় শুরু করল মিগ, দেখতে দেখতে উঠে পড়ল শূন্যে। রাডার ডিটেকশন এড়াতে বালির ঢেউয়ের মাথা ছুঁয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দূর থেকে গোটা দৃশ্যটা দেখল গর্বিত আক্কেল আলি ও তমিজউদ্দিন। নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে, হাসছে। একটু পর মিগের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল তারা

'কেমন দেখলে?' বলল তমিজউদ্দিন।

'ওটা কোথায় গেল?' রানা প্রশ্ন করল।

'কেন, বাংলাদেশ-ভারত বর্ডারে!'

'আমাকে ছাড়া?'

হাসল তমিজ। 'যেতে না পারায় আফসোস হচ্ছে বুঝি? দুঃখ কোরো না। আজ প্রথম দিন ফারুক একাই কাজ সারবে, তেল-মশলার ব্যবস্থা করবে। তুমি যাবে আগামীকাল। ফোড়ন দিতে।'

'কুত্তার বাচ্চা!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ও।

আশ্চর্য, একটুও রাগল না তমিজউদ্দিন। উল্টে দাঁত বের করে

হাসল। ওখানেই নতুন করে তাঁবু ফেলা হলো। রানাকে বাঁধার ব্যাপারে এবার আরও সতর্কতা অবলম্বন করল তমিজউদ্দিন। শুধু হাত নয়, পা-ও বেঁধে ফেলা হলো। সায়মার পা বাঁধা হলো না, তবে ও যাতে রানার ধারে-কাছে যেতে না পারে, সে ব্যবস্থা করা হলো।

পরিস্থিতির কথা ভেবে হতাশ হয়ে পড়ল রানা। যেভাবে বাঁধা হয়েছে, তাতে কেউ এসে খুলে না দিলে মুক্তি নেই।

এগারো

নতুন দিল্লী।

পররাষ্ট্র মন্ত্রীর অফিস থেকে বের হতেই একদল সাংবাদিক ঘিরে ধরল বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ফকরুল ইসলামকে। চতুর্দিক থেকে আসা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলল। প্রশ্ন কিছু তাঁর কানে ঢুকছে, কিছু এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

উত্তর কী দেবেন রাষ্ট্রদূত, তাঁর এখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। স্থানীয় সময় এগারোটায় তাঁকে জরুরী তলব পাঠিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ডি.কে. কৃষ্ণমূর্তি। তৎক্ষণাৎ ছুটে এলেও ভিজিটরস রুমে প্রায় দশ মিনিট বসিয়ে রাখা হয়েছে ফকরুল ইসলামকে, তারপর ভেতরে ডাকিয়ে নিয়ে কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত এমন সমস্ত শব্দ ব্যবহার করে তাঁর সরকারের কড়া প্রতিবাদ ও 'অনতিবিলম্বে ঘটনা সম্পর্কে ঢাকার পরিষ্কার

বক্তব্য' জানাবার দাবি জানিয়েছেন, সে-কথা ভেবে এখনও ক্ষণে ক্ষণে নাকমুখ গরম হয়ে উঠছে রাষ্ট্রদূতের।

কৃষ্ণমূর্তির অগ্নিমূর্তি দেখে রীতিমত ঘাবড়েই গিয়েছিলেন তিনি। দেশের হয়ে গত বিশ বছর নানা দেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করার বিরল অভিজ্ঞতা আছে ফকরুল ইসলামের। কিন্তু এমন মানহানীকর পরিস্থিতিতে পড়েননি কখনও আর। অবশ্য এমন ঘটনাও ঘটেনি কোনদিন।

ভাবতেই পারছেন না রাষ্ট্রদূত, রাশিয়া থেকে সদ্য কেনা বাংলাদেশের একটা মিগ-২৯ আজ ভোরে বিনা উস্কানিতে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালিয়েছে। এর ফলে ২২ জন ভারতীয় নাগরিক মারা গেছে, আহত হয়েছে ৫০-এর বেশি। সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে প্রচুর। প্রায় আধঘণ্টা তাণ্ডব চালিয়ে নিরাপদে সটকে পড়েছে প্লেনটা। এ কি বিশ্বাস করার মত কথা?

কোনমতে সাংবাদিকদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এলেন রাষ্ট্রদূত। মুখে অনবরত খই ফুটছে। 'হ্যাঁ, আলোচনা অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে,' 'অবশ্যই, ঘটনা তদন্ত করে দেখবে বাংলাদেশ। ঘটনা সত্য হলে দোষীকে এই কাজের জন্য কঠোর শাস্তি দেয়া হবে' ইত্যাদি বলতে বলতে প্রায় ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লেন রাষ্ট্রদূত। ভোঁ করে ছুট লাগাল গাড়ি।

গোটা বাংলাদেশ স্তম্ভিত। রেডিওতে সকালের সংবাদে এমন এক পিলে চমকানো খবর প্রচার হওয়ার পর থেকে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে মানুষ। সবার এক আতঙ্ক, ভারত প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আবার কোনও অঘটন ঘটিয়ে না বসে। বিএসএফ দলে ভারী হতে শুরু করেছে দেখে সীমান্ত এলাকার মানুষ দলে দলে পালাচ্ছে এদিক-ওদিক। এপারে বিডিআর পূর্ণ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। কী হয় কী হয় করে সবাই শঙ্কিত।

ইতোমধ্যে জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে কেবিনেট মীটিং বসেছে দুই-দুইবার। স্থির হয়েছে, যেহেতু এটা একটা জাতীয় সমস্যা, এই সঙ্কট কীভাবে মোকাবিলা করা উচিত সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে জাতীয় সংসদে। আগামীকাল বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে, এবং সকল সাংসদ–বিশেষ করে বিরোধীদলীয় সাংসদদের এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয়েছে। আশ্বাস দেয়া হয়েছে তাদের যত খুশি কথা বলতে দেয়া হবে।

ওদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রীতিমত হুলুস্থুল কাণ্ড চলছে। মহাবিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। ভারতের কড়া প্রতিবাদের জবাব তৈরি করে দুপুরেই ঢাকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠানো হলো। লিখিত ভাবে তো বটেই, মৌখিকভাবেও তাঁকে জানিয়ে দেয়া হলো, বর্ডার ঘটনার জন্যে বাংলাদশ বিমান বাহিনী কোনভাবেই দায়ী নয়। বলা হলো: এ দেশে নতুন আসা তিনটে মিগ-উনত্রিশের সবগুলোই এ মুহূর্তে কুর্মিটোলা এয়ার বেসে মজুত আছে। আজ সকাল থেকে এ-পর্যন্ত তার একটাও ওড়েনি। প্রয়োজনে ভারতীয় এয়ারফোর্সের বিশেষজ্ঞরা এ দাবির সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারেন আজই। যে-কোন মুহূর্তে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে বাংলাদেশ প্রস্তুত।

বিকেলের দিকে দু'পক্ষের মধ্যেকার টান্-টান্ উত্তেজনা কিছুটা কমল। কিন্তু সারা ভারত জুড়ে বিক্ষোভ চলতেই থাকল।

দুপুর দুটোর দিকে ওয়াদিতে মিগ-২৯ ল্যান্ড করার শব্দে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসল মাসুদ রানা। তাঁবুর একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল। প্লেনের শব্দ পেয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল মৌল্যানা মোঃ আক্কেল আলি ও তমিজউদ্দিন, খানিক পর ফারুককে নিয়ে ফিরল তারা। রানার সাথে চোখাচোখি হতেই দুই কান বিস্তৃত হাসি ফুটল

পাইলটের মুখে।

'দারুণ এক অভিজ্ঞতা হলো আজ, বুঝলেন?' বলল সে। 'বহুদিন ফ্লাইঙের মজা থেকে বঞ্চিত ছিলাম, আজ তা কড়ায় গণ্ডায় উসুল করে নিলাম। বড় আনন্দ হচ্ছে আমার।'

যুদ্ধ ফেরত বীরের অভ্যর্থনা দেয়া হলো লোকটাকে। তমিজউদ্দিন খুব খুশি। রেডিওতে খবরটা শোনার পর থেকেই আনন্দে ঝলমল করছিল সে। কাছে পেয়ে কথায় কথায় ফারুকের পিঠ চাপড়াচ্ছে। অল ইন্ডিয়া রেডিওর প্রচার করা খবরটা রানাও শুনেছে। দুশ্চিন্তায় আছে ও। দেশের কী অবস্থা কে জানে? রাহাত খান কী ভাবছেন?

কি করে নিজেকে মুক্ত করা যায়, প্রতি মুহূর্তে সেই ভাবনা চলছে মাথায়। কিন্তু উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। নিজের অসহায় অবস্থা কষ্ট দিচ্ছে বড্ডো, মনে মনে ফুঁসছে রানা। ওর জুতোর হিলের গোপন কুঠুরিতে একটামাত্র অস্ত্র আছে–বের করে ভাঁজ খুললে ওটা হয়ে যাবে চার ইঞ্চি ব্লেডের ক্ষুরধার এক ছুরি। সবার অলক্ষে ও বহুবার চেষ্টা করেছে ছুরিটা বের করতে, কিন্তু কাজ হয়নি। হাত যায় না ওই পর্যন্ত।

পরদিন সকাল সাড়ে ছটায় ডেকে তোলা হলো ওকে। সারা রাত জেগেই ছিল রানা, একটু তন্দ্রামত এসেছিল হয়তো, মাথার কাছে তমিজউর্দ্দিনের গলা শুনে চমকে চোখ মেলল। 'ওঠো, ওঠো, সময় হয়েছে। তৈরি হতে হবে এখন।'

সূর্যের প্রথম আলোয় লোকটার দু'চোখ চকচক করছে দেখল রানা। হাসছে নূরানি হাসি।

'কোথায়?' বলল ও।

'সেকী!' কৃত্রিম বিস্ময় ফুটল তমিজের চেহারায়। 'রাতভর রামায়ণ পাঠ শুনে ভোরবেলা প্রশ্ন করছ সীতা কার বাপ?' একটু বিরতি। 'উঠে পড়ো। আজিজ, এর দাড়ি কামাবার ব্যবস্থা করো।

পাইলটের গালে তিনদিনের গিজগিজে দাড়ি থাকতে পারে না।'

'অল্পকিছু দাড়ি নিয়ে মরলে কিছুটা ইসলামিক হতো না?' টিটকারি মারল রানা। 'মরতেই যখন হচ্ছে...'

'না, হজরত। কোনও ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। বলা যায় না, গতকালকের ঘটনায় সতর্ক থাকবে গোটা দুনিয়ার সশস্ত্র বাহিনী। কতগুলো দেশ ডিঙিয়ে যেতে হবে তোমাকে, সে খেয়াল আছে? কেউ যদি ফেলে দেয় অ্যান্টি এয়ারক্রাফট কামান দেগে? সেজন্যেই তো কভারল্স, পাইলটের সাজপোষাক; দাড়ি কামিয়ে ফিটফাট হওয়া!'

'বাঁধন খুলে দাও,' রানা বলল। 'আমি নিজেই শেভ করছি।'

আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করল তমিজউদ্দিন। 'পাগল! শেষ সময়ে নিজের গলায় ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করে আমাদেরকে বিপদে ফেলো আর কী!'

এরপর আর কথা চলে না। নির্দয়ের মত ক্ষুর চালিয়ে কাজটা শেষ করল আজিজ, এরপর কভারলস্ পরিয়ে নাস্তা খেতে দেয়া হলো। দূর থেকে সায়মা অপলক দেখছে ওকে। রানা নির্বিকার। যদিও মাথার ভেতর একশো মাইল বেগে চলছে চিন্তার ঝড়। ওর পিছনে তিন হাতের মধ্যে মেশিন পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে বদিয়া, কিছুই করার উপায় নেই।

বাংলাদেশের খবর ধরা হলো রেডিওতে। কান খাড়া হয়ে গেল রানার। সত্যিই জরুরী ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। হা-হা করে হেসে উঠল মুফতি তমিজ। জাতির এই সঙ্কটমুহূর্তে সংসদ বর্জন না করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বিরোধীদলীয় নেত্রী বিবৃতি দিয়েছেন। সদলবলে জরুরী এই অধিবেশনে যোগ দিচ্ছে বিরোধীদল। আরও জোরে হেসে উঠল তমিজউদ্দিন, সে-হাসিতে যোগ দিল মৌলানার খ্যাক-খ্যাক হাসি। খুশিতে দ্বৈতকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ওরা, 'মারহাবা! মারহাবা!'

এদেরকে চমকে দিয়ে একটা কিছু ঘটিয়ে বসা একেবারে অসম্ভব নয়, ভাবছে রানা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অন্তত এই দুটোকে খতম করে দিতে পারে ও, কিন্তু তারপর? অন্যদের সামাল দেবে কী করে? ওরা সবাই সশস্ত্র। ট্রাক ড্রাইভারটাও। এতজনকে সামাল দেয়া কঠিন হবে। প্রথম সুযোগেই ওরা গুলি করবে হাঁটুতে।

মনে মনে হাসল ও। আর একটা কাজ করা যায়, একটা অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন ফারুককে খতম করে দেয়া যায়। কিন্তু সেরকম কিছু করতে চায় না রানা। তাহলে একটি প্রাণীও বাঁচবে না এখানে।

নাস্তা দেয়া হলো। একমনে খাচ্ছে রানা।

'কী ব্যাপার!' ফারুকের বিরক্ত কণ্ঠ শুনে মুখ তুলে তাকাল ও। আটটা বেজে গেছে। উত্তেজনায় ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে লোকটা। চাউনি চকচকে, কপালে চিকন ঘাম। 'এখনও হয়নি? এত খেয়ে হবেটা কি, এসব হজম করার তো সময় পাবেন না, চলুন।'

আরেকবার হাত বাঁধা হলো রানার, তাঁবুর বাইরে নিয়ে এলো আজিজ ও বদিয়া। পিছন পিছন আসছে ফারুক, তমিজউদ্দিন। ফারুকের হাতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ছাপ মারা সেই ফ্লাইট ব্যাগটা। সবার পিছনে আসছে মৌলানা আক্কেল আলি। পিছনে হাত বেঁধে ভারিক্কি চালে হাঁটছে, কারণ নাটের গুরু তো সে-ই। সায়মার দেখা নেই। তাঁবুতে রয়ে গেছে মেয়েটা।

নিশ্চল মিগের কাছে এসে দাঁড়াল দলটা। রি-ফুয়েলিং শেষ হয়েছে। আকাশের পটভূমিতে ভৌতিক লাগছে ওটাকে। সকালের রোদে চকচক করছে রুপোলি মাছের মত। মুখ তুলে ফ্রন্ট ও রিয়ার সীটের মধ্যেকার ব্যবধান দেখে নিল রানা।

'এখন তোমার হাত খুলে দিচ্ছি আমি, জনাব মাসুদ রানা,'

তমিজউদ্দিন বলল। 'দয়া করে নায়ক হওয়ার চেষ্টা কোরো না।'

করলে কী ঘটবে, যেন সেটা বোঝাতেই দুই ষণ্ডা ওর একদম পিছনে এসে দাঁড়াল। পিঠে দুটো নলের স্পর্শ পেল রানা। দেখল ফারুক ফ্লাইট ব্যাগ থেকে ওর প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথারটা বের করছে। ওটার জন্যে একটা অ্যাঙ্কেল রিগও বের করল। এক হাঁটু গেড়ে বসে রানার ডান গোড়ালির একটু ওপরে বাঁধল সে হোলস্টারটা, স্ট্র্যাপ টেনেটুনে দেখল ঠিক আছে কি না। তারপর পিস্তলটা রেখে দিল ওর মধ্যে। ক্লিপ খালি ওটার, চেম্বারও খালি।

'এত কষ্টের প্ল্যানিঙে মারাত্মক একটা খুঁত থেকে গেল যে!' বলল রানা।

'কোথায়?' প্রশ্ন করল ফারুক।

'একজন পাইলটের পিস্তল খালি থাকবে কেন? আমার লাশ যখন পাওয়া যাবে, তখন গুলি ছাড়া পিস্তল দেখলে সন্দেহ হবে না মানুষের?'

'তা হয়তো হবে,' তমিজউদ্দিন বলল। 'কিন্তু তাই বলে তোমার হাতে তাজা বুলেট তো আর তুলে দিতে পারি না!'

হাসি ফুটল রানার মুখে। 'কেন, ভয়?'

'ওঠো!' কড়া গলায় বলল তমিজ, ল্যাডারের দিকে ঠেলে দিল রানাকে।

'এক মিনিট।'

'আবার কী?' অধৈর্য হয়ে উঠল সে।

'সায়মার ব্যাপারে কী করবে বলে ঠিক করেছ তোমরা?'

'কিছু একটা তো করবোই।'

'তার কি কোন দরকার আছে?' রানা বলল। 'তোমাদের কাজ হয়ে গেলে ও কি আর কোনও ক্ষতি করতে পারবে?'

'দুঃখিত,' শ্রাগ করল লোকটা। 'এ ব্যাপারে কারও পরামর্শের প্রয়োজন নেই আমার। চলো।'

'দাঁড়াও।'

'কী?' চরম বিরক্তি বোধ করছে সে।

'মেয়েটার কাছ থেকে বিদেয় নেয়ার জন্যে আমাকে দুটো মিনিট সময় দাও।'

আক্কেল আলির দিকে ফিরে অসহায় ভঙ্গি করল তমিজউদ্দিন 'কারও শেষ ইচ্ছে পূরণ করাই উচিত, কি বলেন, হুজুর?' লোকটা মাথা ঝাঁকাতে আজিজের উদ্দেশে হাত নাড়ল। 'যাও, নিয়ে এসো মেয়েটাকে। হাত খুলে দিয়ো।'

এক মিনিট পর কাঁটাঝোপের কাছে মুখোমুখি হলো রানা ও সায়মা। অন্যরা গজ দশেক দূর থেকে নজর রেখেছে ওদের ওপর। আজিজ-বদিয়ার অস্ত্র প্রস্তুত।

'ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে!' ওর চোখে চোখ রেখে কাঁপা গলায় বলল সায়মা। 'যদি...' এক হাতে রানার গলা জড়িয়ে ধরল। একই মুহূর্তে তলপেটের কাছে শক্ত কিছু একটা অনুভব করল রানা।

'কী?' বিস্মিত হলো ও।

'তোমার পিস্তলের গুলি ভর্তি একটা ম্যাগাজিন,' সায়মা বলল।

চমকে উঠল রানা। 'তুমি পেলে কোথায় ওটা?'

'পরশু, হাউসবোটে। চুমু খাও আমাকে, ওরা তাকিয়ে আছে।'

চুমু খেল রানা। একটু পর মুখ আধইঞ্চি পিছনে সরিয়ে বলল মেয়েটা, 'কাল ওরা যখন তোমাকে অজ্ঞান করে বোটে তুলছিল, তখন তোমার পকেট থেকে পড়ে যায় ওটা। আমি পিছন থেকে তুলে নিই। পিছনে আমি একাই ছিলাম, কেউ দেখেনি।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, সায়মা,' আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সাথে বলল রানা। 'বিরাট উপকার করলে,' বলে হাসল। 'মনে মনে প্রস্তুত থেকো, আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে

আসব। ওটা আমার সাইড পকেটে ছেড়ে দাও।'

'দিয়েছি।'

সঙ্গে সঙ্গে ফারুকের তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল। 'হয়েছে! এবার দয়া করে আসুন।'

পাত্তা না দিয়ে ঝড়ের গতিতে বিশেষ কয়েকটা নির্দেশ দিল ও মেয়েটাকে। শুনতে শুনতে চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল সায়মার। মাথা ঝাঁকাল রানার বলা শেষ হতে। 'পারব।'

'শুধু পারব বললে চলবে না। পারতেই হবে। ওকে, চলি,' সায়মার চোখের পানি মুছিয়ে দিল রানা। তারপর ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্লেনের দিকে এগোল। মনে মনে আল্লাহকে ডাকছে যাতে ওর পকেটের সামান্য ফোলাটা কারও নজরে না পড়ে। তেমন একটা ফুলে নেই যদিও। পিস্তলের ম্যাগাজিন একটা ম্যাচ বাক্সের চেয়েও পাতলা, তবে ওজন আছে। ওজনের কারণে হয়তো ঝুলে থাকতে পারে সামনের দিকে, তাহলে সমস্যা হবে।

হলো না। ওড়ার জন্যে ফারুক এত ব্যস্ত, এত হুড়োহুড়ি শুরু করে দিল যে কেউ কোনদিকে তাকাবারও সময় পেল না। তাছাড়া প্লেনের ছায়ায় ওর পকেটের এই সামান্য পরিবর্তন চোখে পড়ার কথাও নয়। রিয়ার ককপিটের একদিক দিয়ে ফারুক উঠল, অন্যদিক দিয়ে রানা। ল্যাডারে তমিজউদ্দিন ওর প্রায় গায়ের সাথে সেঁটে থাকল। সুড়ুৎ করে গানার-নেভিগেটরের সরু কম্পার্টমেন্টে নিজেকে সেঁধিয়ে দিল রানা।

ব্যস্ত হাতে ককপিটের স্লাইড প্যানেলের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে ওর দু'হাত বেঁধে দিল ওরা দুজন। যথেষ্ট মজবুত করে বাঁধার পরও সন্দেহমুক্ত হতে পারল না তমিজউদ্দিন। 'তুমি শিওর, এতেই কাজ হবে?'

বাঁধনগুলো টেনে পরীক্ষা করে মাথা ঝাঁকাল পাইলট। 'হবে।'

'ক্র্যাশ করার পর যদি দেখা যায় এভাবেই হাত বাঁধা অবস্থা

বসে আছে, তাও পিছনের সীটে?'

হাসল ফারুক। 'পাগল! ক্র্যাশের পরেও এইসব স্ট্র্যাপ থাকবে নাকি? পুড়ে যাবে না? সাথে হয়তো ওর হাত দুটোও পুড়বে। আর ও থাকবে উইন্ডশীল্ডের ওপর, ভর্তা, চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে। সে জন্যেই তো সীট স্ট্র্যাপের সাথে বাঁধলাম না ব্যাটাকে।'

'গুড,' মাথা ঝাঁকাল তমিজউদ্দিন। রানাকে ফ্লাইট হেলমেট পরিয়ে দিল। 'অক্সিজেন মাস্ক পরিয়ে দেব?'

মাথা নাড়ল রানা। ব্যাটারা পা বাঁধেনি বলে খুশি। উত্তেজনায় ধড়ফড় করছে বুক। 'দরকার নেই।'

'পাকিস্তানের কোন্দায় রি-ফুয়েলিঙের সময় এর ব্যাপারে খুব সাবধান থাকবে,' ক্যাপ্টেন ফারুককে শেষ উপদেশ দিয়ে মাঝ ল্যাডার থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল বেতমিজ লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানার মগজ—কোন্দা তো ওর চেনা! তালেবানদের শক্ত একটা ঘাঁটি।

ডান পা-টা অনেক কষ্টে বাঁ হাঁটুর ওপর তুলে আনল ও, বাঁ হাতের কাছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, জুতোর হিলের গোপন কুঠুরি থেকে ছুরিটা চলে এলো হাতে। এবার ভাঁজ খুলতে হবে ওটার। এরই মধ্যে হেলমেটের ভিতর ঘামতে শুরু করেছে ও।

ওদিকে সামনের ককপিটে বসে পড়েছে ক্যাপ্টেন ফারুক, ব্যস্ত হাতে নিজেকে বাঁধছে সীটের সাথে। তমিজউদ্দিন আর আক্কেল আলি সরে গেছে প্লেনের কাছ থেকে। আজিজ, বদিয়া ও ট্রাক ড্রাইভার মার্কারগুলো তুলে নিয়ে সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করায় ব্যস্ত। দৌড়ে দৌড়ে কাজ করছে ওরা।

ছুরি ধরা হাতের কবজি ঘুরিয়ে বাঁধন কাটতে শুরু করল মাসুদ রানা, এমন সময় হুঙ্কার ছেড়ে চালু হলো মিগের প্রচণ্ড শক্তিশালী টুইন এঞ্জিন। কাজের ফাঁকে দর্শকদের দলটার দিকে তাকাল ও, প্লেন থেকে ফুট পঞ্চাশেক দূরে রয়েছে সবাই। হাঁ

করে তাকিয়ে আছে।

ব্যস্ত হয়ে সায়মাকে খুঁজল রানা। কোথাও নেই ও। কাজে লেগে পড়েছে। গুড! খুশি হলো রানা।

এখন কাজের সময়, তামাশা দেখার সময় নয়।

ঝাপ্সা চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সায়মা। দৃঢ় পায়ে প্লেনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে ও। চলে যাচ্ছে তার জীবনের প্রথম প্রেম, প্রথম স্বপ্নপুরুষ। যাওয়ার আগে অনেক সান্ত্বনা আর আশ্বাস দিয়ে গেছে ওকে। সায়মা জানে সেসব মিথ্যে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হবে মাসুদ রানার। তবু ভাল, আড়ালে ঘটবে ব্যাপারটা। ওকে চোখে দেখতে হবে না।

রানাকে বাঁধাছাঁদার কাজ শেষ করে তমিজউদ্দিনকে নেমে পড়তে দেখে হুঁশ হলো ওর। মন শক্ত করল। এখন শোক প্রকাশের সময় নয়, রানার পরিণতি নিশ্চিত হলেই ওর দিকে নজর দেবে তমিজউদ্দিন। সে জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে। জেট এঞ্জিনের কান ফাটানো গর্জন শুনে চমকে উঠল ও, এক-পা দু'পা করে পিছাতে শুরু করল।

দশ কদম মত গিয়ে ঘুরেই তাঁবুর দিকে ছুটল ও। ভেতরে ঢোকার আগে থেমে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল—নাহ্, কারও খেয়ালই নেই এদিকে। রাগ, ভয়, হতাশায় ফোঁপাচ্ছে সায়মা, পাগলের মত বিড়বিড় করে প্রলাপ বকছে, অথচ খেয়ালই নেই।

শেষবারের মত পিছনটা দেখে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকে পড়ল সায়মা, অস্ত্র খুঁজছে হন্যে হয়ে। বেশি খুঁজতে হলো না, ক্যাপ্টেন ফারুকের বালিশের পাশেই মেশিন পিস্তলটা পড়ে থাকতে দেখে প্রায় হামলে পড়ল ওটার ওপর। সব সময় তার সাথেই থাকত ওটা, ফ্লাইটে থাকার সময় ছাড়া।

উড়তে যাচ্ছে বলে আজও নেয়নি, ফেলে রেখে গেছে।

এমনিতে কোন সমস্যা হওয়ার কথা ছিল না তাতে। হয়েছে রানা সায়মার সাথে শেষ সাক্ষাৎ করতে চাওয়ায়। মেয়েটাকে বাঁধনমুক্ত করে দিয়েছে ওরা, কিন্তু নজর রাখার দরকার বোধ করেনি, খুব সম্ভব মেয়েমানুষ বলেই। এদিকে ফারুকের অস্ত্রটা তাঁবুতে অরক্ষিত পড়ে আছে, আনন্দের ঠেলায় সে কথা তার মনেই ছিল না। বলেও যায়নি কাউকে।

মনে মনে মাসুদ রানাকে ধন্যবাদ দিল মেয়েটা। একমাত্র রানাই খেয়াল করেছিল ব্যাপারটা, সেজন্যে সায়মার সাথে শেষ দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল।

বারো

এঞ্জিনের ভয়াবহ গর্জনে কান পাতা দায়। তার ওপর ককপিট ক্যানোপি এখনও খোলা। লক করা হয়নি, ফলে রানার কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার জোগাড়। কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই, বাঁধন কাটায় ব্যস্ত ও। এরই মধ্যে অ্যাঙ্কেল রিগ থেকে ওর প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার পিপিকে বের করে নিয়েছে রানা, পেট ভর্তি বুলেট নিয়ে এ মুহূর্তে ওর কোলের ওপর শুয়ে আছে ওটা।

সময় নেই। দ্রুত সময় ফুরিয়ে আসছে, জানে ও। এঞ্জিনের সুর প্রতি মুহূর্তে চড়ছে, তীক্ষ্ণ হচ্ছে। বড়জোর আর দু'মিনিট আছে হাতে, এরই মধ্যে কাজ সারতে হবে। উন্মত্তের মত ছুরি চালাচ্ছে রানা, কিন্তু বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না। একে স্ট্র্যাপগুলো

চামড়ার, সহজে কাটা যায় না, তার ওপর ছুরি ধরা হাতের কব্জি ঠিকমত ঘোরাতে পারছে না বলে দেরি হয়ে যাচ্ছে। তারচেয়েও বড় সমস্যা, অজায়গায় পোচ লেগে এরই মধ্যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে রানার হাত।

এর মধ্যে দু'বার জান উড়ে গিয়েছিল ওর এঞ্জিনের ঝাঁকিতে মুঠো থেকে ছুরি খসে পড়ে যাচ্ছে ভেবে। অবশ্য সাবধান ছিল বলে পড়েনি শেষ পর্যন্ত।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখ তুলে বাইরে তাকাচ্ছে ও। আগের জায়গাতেই জটলা পাকিয়ে আছে লোকগুলো, সবার চোখ আঠার মত সেঁটে আছে প্লেনের ওপর। রানার ভাগ্য ভাল যে ওর মাথার সামান্য অংশই শুধু দেখতে পাচ্ছে ব্যাটারা। সন্দেহ করার কোনও কারণ খুঁজে পায়নি। রানার হাত নড়ছে ওদের চোখের আড়ালে।

সামনের ককপিটে নড়াচড়া টের পেয়ে তাকাল রানা। বাইরের জটলার উদ্দেশে হাত তুলে এক আঙুল দেখাচ্ছে ফারুক–এক মিনিট। মিগের লেজ এরই মধ্যে ঘুরতে শুরু করেছে, ওয়াদির খোলা মুখের দিকে নাক ঘোরাচ্ছে ধীর ভঙ্গিতে। ঠোঁট কামড়ে ধরে লেদার-স্ট্র্যাপে শেষ পোচটা চালাল রানা। দরদর করে ঘামছে উত্তেজনায়। মুক্তির আনন্দে গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে। ছুরি ফেলে চট্ করে ওয়ালথার তুলে নিল রানা, বাঁ হাতের এক ঝটকায় হেলমেটের ভাইজর তুলে দিল ভালমত দেখতে পাবে বলে। এখন যে কোন মুহূর্তে কাজ শুরু করবে ক্যানোপির হাইড্রলিক, বুঁজে আসতে শুরু করবে ডিমের খোসার মত প্রায় গোল ক্যানোপি। বাইরের জটলাটার পিছনে সায়মাকে দেখতে পেল রানা, দু'হাতে মেশিন পিস্তল ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। এক ঝট্কায় দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। আলোর সামান্য পরিবর্তনেই পিছন ফিরে চাইল ফারুক। রানার হাতে পিস্তল দেখে প্রথমে ভয় পেল, তারপর হাসল। ভাইজারটা ওপরে তুলে বলল,

'গুলি নেই ওতে। কিন্তু...কিন্তু...তোমার হাত খুলল কী করে!'

হাত লম্বা করে ওয়ালথারের ট্রিগার টেনে দিল রানা।

মিগের গর্জনের তলায় বিস্ফোরণের শব্দ চাপা পড়ে গেলেও কপালে গুলি খেয়ে ফারুকের হুমড়ি খাওয়ার দৃশ্য সবাই দেখল। অবশ্য স্পষ্ট বুঝতে পারেনি কী ঘটে গেছে। উইন্ডশীল্ড আর কন্ট্রোল প্যানেল ফারুকের রক্তে-মগজে মাখামাখি হয়ে উঠতে দেখে নিশ্চিন্ত হলো রানা, মাথা নিচের দিকে করে ডাইভ দিয়ে বেরিয়ে এলো ককপিট থেকে। মাটিতে পড়েই একটা গড়ান দিয়ে সিধে হলো, ওয়ালথার প্রস্তুত।

পরিস্থিতি বোঝার জন্যে সদলবলে এদিকে ছুটে আসছিল তমিজউদ্দিন, সিকি পথ আসার আগেই পিছন থেকে গর্জে উঠল সায়মার মেশিন পিস্তল। সংক্ষিপ্ত ব্রাশ। একজন কমে গেল দলের, একেবারে জায়গায় আছড়ে পড়ল কেউ কাটা কলাগাছের মত। এমন অপ্রত্যাশিত আক্রমণে সম্পূর্ণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল অন্যরা। এগোবে, না পিছনের বিপদের মুখোমুখি হবে, ভাবতে গিয়ে মূল্যবান কয়েকটা মুহূর্ত নষ্ট করে ফেলল তমিজউদ্দিন। ততক্ষণে ওদের ত্রিশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে রানা।

ট্রাক ড্রাইভার লোকটাই সামলে নিল সবার আগে। রানাকে বড় বিপদ মনে করে মেশিন পিস্তল তুলল সে, কিন্তু শূটিং প্রতিযোগিতায় হেরে গেল। অস্ত্র কোমর বরাবর তোলামাত্র কপালের ঠিক মাঝখানে ওয়ালথারের গুলি খেয়ে উল্টে পড়ল। ওদিক থেকে দ্বিতীয় দফা গুলি ছুঁড়ল সায়মা, এবারও একইরকম শর্ট ব্রাশ। এভাবেই গুলি করতে বলেছিল ওকে রানা, যাতে এক ধাক্কায় ম্যাগাজিন খালি না হয়ে যায়। দুই দিকের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে উঠল বাকিরা। লক্ষ্যহীন গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি করছে।

সুযোগটা পুরোপুরি নিল রানা, পরপর তিনটা গুলি ছুঁড়ে

আরও দিশেহারা করে তুলল ওদের। এই ফাঁকে ছুটে গিয়ে ড্রাইভারের মেশিন পিস্তলটা তুলে নিল। এক হাতে হেলমেটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়ে এক দফা ব্রাশ ফায়ার করল। গুলি করল সায়মাও।

তাঁবুর দিকে যাওয়ার উপায় নেই। মেয়েটার জন্যে, এদিকে ওয়াদির কোথাও গা ঢাকা দেয়ার পথও আগলে রয়েছে মাসুদ রানা, তাই আত্মরক্ষার একমাত্র পথ বেছে নিয়েছে তমিজউদ্দিন ও আজিজ। শুয়ে পড়েছে। কিন্তু আক্কেল আলি তা করল না। কোন ধরনের অ্যাকশনের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। তাই পালিয়ে যাওয়াই উপযুক্ত কাজ হবে ভেবে কাঁটাগাছগুলোর দিকে দৌড় দিল সে। ভূতের তাড়া খাওয়া দিশেহারা লোকের মত।

কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতে আচমকা পাকা টম্যাটোর মত বিস্ফোরিত হলো তার মাথা। ঘুরে দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে। তাই দেখে অসহ্য রাগে, দুঃখে নিজের চুল ছিঁড়তে লাগল তমিজউদ্দিন। চোখের সামনে এত যত্নে রচনা করা স্বপ্ন ভেঙে খান্-খান্ হয়ে যাচ্ছে দেখে উন্মাদ দশা। ওদিকে মিগের গর্জনে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সমানে হুঙ্কার ছাড়ছে ওটা। এ অবস্থা বেশিক্ষণ চলতে দেয়া যায় না, ভাবল রানা, তাড়াতাড়ি ঝামেলা শেষ করে ফেলতে হবে। পরিকল্পনা ঠিক করে নিল ও।

তমিজউদ্দিন ও আজিজের আবছা কাঠামোর ওপর চোখ রেখে বুকে হেঁটে পিছাতে শুরু করল। মনে মনে আল্লাহকে ডাকছে যাতে মেয়েটা আরও কিছু সময় ওদেরকে জায়গায় আটকে রাখতে পারে। কয়েক পা পিছাতেই বুঝল ঢালু জায়গায় এসে পড়েছে ও–ওয়াদির পাড়! পিছলে কয়েক ফুট নেমে এলো রানা, কোমর থেকে ওপরের অংশ সামনে ঝুঁকিয়ে ঘুরপথে শত্রুর পিছনে যাওয়ার জন্যে ছুটল।

মিনিট পাঁচেক দৌড়ে, ক্রল করে মোটামুটি সুবিধেজনক একটা জায়গায় এসে পৌঁছল রানা। ওর দশ-পনেরো গজ সামনে, একটু ডানদিক ঘেঁষে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে লোক দুটো। দুদিকে মুখ করে। রানা রয়েছে ওদের হাঁটু বরাবর, তমিজউদ্দিন রানার দিকে। থেকে থেকে ঠুস্-ঠাস্ করছে দু'জনেই, আন্দাজে গুলি করছে। মনে মনে হাসল রানা, ওদের অবস্থা দেখে।

চাঁদি ফাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে মরুভূমির সূর্য, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। কভারলস্-এর ভেতর ঘেমে নেয়ে এক-সা অবস্থা। আরও একটু এগোল।

এক হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হলো রানা, অন্য হাঁটু 'দ' বানিয়ে তার ওপর রাখল মেশিন পিস্তল ধরা বাম হাতের কনুইটা।

'তমিজউদ্দিন!' চেঁচিয়ে ডাকল।

চমকে উঠল লোকটা, ব্যস্ত হয়ে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। ডাক শুনেছে, কিন্তু কোনদিক থেকে এলো বোঝেনি। লোকটাকে সাহায্য করল ও। 'আমি তোমার ডানদিকে!'

ঝট্ করে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল সে, পরক্ষণে ভূত দেখার মত চমকে উঠল রানাকে প্রায় ঘাড়ের ওপর পজিশন নিয়ে বসা দেখে। দেখল আজিজও, সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

'হ্যালো, বেতমিজ!' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'পরপারের ডাক শুনতে পাচ্ছ?'

মাথা এবার পুরোপুরিই বিগড়ে গেল লোকটার। শত্রু ডানদিকে, তাকে উপুড় অবস্থা থেকে গুলি করতে হলে যে অন্তত বাঁ কাঁধে ভর দিয়ে গুলি করা উচিত, এই সাধারণ বিষয়টাও গুলে খেয়ে ফেলেছে ত্রাসের ঠেলায়। এক ঝট্কায় মেশিন পিস্তলটা তুলেই ট্রিগার টেনে ধরল। রানার ধারকাছ দিয়েও গেল না একটা গুলি।

রানার গুলি মিস হলো না। পেট, উরু আর হাঁটুতে কয়েকটা

গুলি খেয়ে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠল লোকটা. অস্ত্র উড়ে গেছে হাত থেকে। লোকটাকে হত্যা নয়, আহত করার ইচ্ছে ছিল ওর, তাই বুকের নিচে লক্ষ্যস্থির করেছিল। রানার প্রায় সাথে সাথেই আজিজও গুলি করেছিল, কিন্তু আতঙ্কে আড়ষ্ট মস্তিষ্কের নির্দেশ সময়মত পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে লোকটার আঙুল, দেরি করে ফেলেছে। ততক্ষণে অবশিষ্ট ম্যাগাজিন তার ওপর খালি করে ফেলেছে মাসুদ রানা।

কাজ সেরে উঠে পড়ল। ওয়ালথার বাগিয়ে এগিয়ে গেল তমিজউদ্দিনের দিকে। ক্ষতগুলো চেপে ধরে সেজদার ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে ফোঁপাচ্ছে লোকটা, গোঙাচ্ছে মৃত্যুযন্ত্রণায়। দু'জনের রক্তে ভিজে গেছে অনেকখানি জায়গার বালি। তমিজউদ্দিন সমানে রক্ত হারাচ্ছে। রানাকে দেখে অনেক কষ্টে মুখ তুলল সে, আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর হাতে পিস্তল দেখে।

'তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্ন ভেঙে গেলে কেমন লাগে, এখন বুঝতে পারছ, বেতমিজ?' বলল ও। 'বোনকে হারিয়ে, তোমার নীচ চক্রান্তে জীবনের আদর্শ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়ে কেমন লেগেছিল শহীদুল্লাহ্‌র, বুঝতে পারছ?'

চেহারা করুণ হয়ে উঠল লোকটার। 'পি-প্লী-জ! আমাকে বাঁচাও...ডাক্তার...'

'ডাক্তার! এখানে ডাক্তার কোথায়?' ওয়ালথার তুলল রানা। 'তারচে' আমি বরং একটা পেইনকিলার ক্যাপসুল দিচ্ছি, সেরে যাবে সব।'

'না! প্লীজ...মেরো না আমাকে! আমি...'

'তোমার কাছে আমাদের কারও জীবনের কোনও দাম ছিল না, এখন নিজের জীবনটাকে এতো দাম দিচ্ছ কেন, তমিজ?'

হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল তমিজউদ্দিন, কী বলল বোঝা গেল না।

হাত এক চুল কাঁপল না মাসুদ রানার, চোখের পাতাও না। নির্দয়, কঠিন হাসি ফুটল মুখে। 'জাহান্নামে যাও, তমিজউদ্দিন। তোমার বেঁচে থাকার কোন দরকার নেই।'

গুলি করল ও। জোর এক ঝাঁকি খেল তমিজউদ্দিনের মাথা, কাত হয়ে পড়ে গেল দেহটা। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুখ তুলল রানা, দেখল সায়মা দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ও, তারপর ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে। আনন্দে ফোঁপাচ্ছে।

সামনের দিগন্তে বঙ্গোপসাগর দেখা দিতে বিএএফের নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে কথা বলতে শুরু করল রানা: দিস ইজ বিএএফ ফ্লাইট জি থার্টি টু-এম, রিপিট, বিএএফ ফ্লাইট জি থার্টি টু-এম, দ্য লস্ট মিগ টোয়েন্টি নাইন, রিপোর্টিং অ্যাপ্রোচ...'

পরপর কয়েকবার একই বার্তা আউড়ে গেল রানা। প্রথমে কিছুক্ষণ নীরব থাকল রেডিও, তারপর চারদিক থেকে মহা চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রায় সবগুলো ঘাঁটি থেকে প্রশ্ন আসছে। ও কে, কেন আসছে প্লেনটা, কোথায় ছিল এতদিন, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটারও জবাব দিল না ও, থেকে থেকে কেবল আগের মেসেজটাই রিপিট করে গেল। ঢাকার কাছাকাছি এসে শুধু নিজের নামটা উচ্চারণ করল বারকয়েক।

একটু পর পর রিয়ার ভিউ মিররে সায়মাকে দেখছে রানা। গানার-নেভিগেটরের সীটে নিশ্চিন্তে বসে আছে মেয়েটা, ফ্লাইট কভারল্স আর হেলমেটে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। এগুলো ওকে পরাতে হয়েছে, কারণ পাক-আফগান সীমান্তের কোন্দায় রি-ফুয়েলিঙের সময় গানার-নেভিগেটরের সীটে একটা মেয়ে দেখা গেলে সমস্যা হতো।

মেয়েটাকে সঙ্গে না এনে উপায় ছিল না রানার। এই প্লেন নিয়ে আর কোথাও ল্যান্ড করলে কূটনৈতিক ঝামেলায় পড়তে হত, কয়েকদিন লেগে যেত দেশে ফিরতে, তাই কোন্দায় নেমে তেল নিয়ে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই উঠে পড়েছে আকাশে। তারপর লো ফ্লাই করে সোজা বাংলাদেশ।

সন্ধের একটু আগে কুর্মিটোলায় টাচ্ ডাউন করল মিগ-২৯। থেমে দাঁড়াতেই চারদিক থেকে ছুটে এসে প্লেনটাকে ঘিরে ধরল কয়েকটা জিপ ও ট্রাক।

হাসিমুখে নেমে এলো রানা সায়মাকে নিয়ে।

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

ব্লাইন্ড মিশন

কাজী আনোয়ার হোসেন

বার্লিন থেকে সড়কপথে রওনা হয়ে গ্রীসে পৌঁছতে হবে মাসুদ রানাকে, সঙ্গে থাকবে দু'জন সশস্ত্র পুরুষ সঙ্গী, আর থাকবে এক ডানাকাটা পরী। কার্গো হিসেবে রয়েছে কাঠের একটা বাক্স, কিন্তু প্রশ্ন করা যাবে না কি আছে সেটায়–অসম্ভব ভারী, ছুঁলে বরফের মত ঠাণ্ডা লাগে। যেতে হবে, আবার দ্রুত ফিরেও আসতে হবে বার্লিনে– সব মিলিয়ে পাড়ি দিতে হবে প্রায় তিন হাজার মাইল পথ। সাহসে বুক বেঁধে থাকুন ওর সঙ্গে, দেখুন কি হয়।

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খামে বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

আনিসুজ্জামান,
হার্স্ট, টেক্সাস-৭৬০৫৩, ইউএসএ

সেই 'ধ্বংস-পাহাড় থেকেই সেবা'র সাথে পথ চলা। সেবা'র স্লোগানঃ সেবা বই, প্রিয় বই; অবসরের সঙ্গী। এই অবসরের সঙ্গী শব্দ দুটোয় আমার কিছুটা আপত্তি আছে। কারণ সেবা আমার সকল সময়ের সঙ্গী, আমার কর্মক্ষেত্রে, আমার গাড়িতে, এমন কি সকাল বেলার একলা থাকার সময়টাতেও সেবা আমাকে সঙ্গ দেয়। এত কথা বলার উদ্দেশ্য সেবার প্রতি আমার ভালবাসার পরিমাপ বুঝিয়ে দেয়া।

আমার সংগ্রহে সেবার প্রায় সব বই-ই আছে, এবং এই সুদূর প্রবাসে বসেও সেবার বই নিয়মিত পাওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছি। আমরা জানি আপনার হাতে আগের মত সময় নেই, তাই রানার খসড়া রচনায় মাঝে মাঝে অন্যদের সাহায্য নিতে হয়। এই সাহায্যকারী লেখকদের প্রতি আমার একটা আবেদন আছে–তাঁরা যেন রানার আগের বইগুলি একটু গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেন। তাহলে রানা কাহিনীতে যেসব সহযোগী চরিত্র আছে তারা সঠিক ভাবে রূপায়িত হবে। তা নইলে রানার মজা অনেকখানি নষ্ট হয়, মান নেমে যায়। কয়েকটা বইয়ে রূপাকে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন-তেন কাঁদুনে মেয়ে হিসাবে; অথচ আমরা সবাই জানি ও বিসিআই-এর একজন অসাধারণ এজেন্ট। এইরকম বিচ্যুতি বড় আঘাত দেয় মনে।

রানা এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ স্পাই থ্রিলার। এর মানের ব্যাপারে

সচেতন হওয়া আমাদের সকলের কর্তব্য। রানা আমার দীর্ঘদিনের সঙ্গী। জীবনে চলার পথে এই বই আমার বহু উপকার করেছে। তাই রানায় সামান্য ত্রুটি দেখলেও আমার খুব লাগে। আমাদের এই যান্ত্রিক জীবনের ছন্দোবদ্ধ ছন্দহীনতায় বিবর্ণ কাগজের মত ম্যাড়মেড়ে জীবনে কিছুটা হলেও উষ্ণতা, উচ্ছ্বাস, প্রাণচাঞ্চল্য আর স্বপ্ন দেখা সেবা'র জন্য সম্ভব হচ্ছে, সেজন্য সেবাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আপনার আলোচনার ছত্রে ছত্রে সেবা'র প্রতি গভীর মমতার প্রকাশ যে আমাকে কতটা স্পর্শ করেছে তা বলে বোঝাতে পারব না। চিঠিটি পড়ে আপনার মত আমিও নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছি নিজেরই অজান্তে। আপনাকে অনেক...অনেক...অনেক ধন্যবাদ।

নিঝুম ও শ্রাবন্তী,
নোয়াখালী সরকারী কলেজ, নোয়াখালী।

আমরা তিন গোয়েন্দা ও মাসুদ রানার নিয়মিত পাঠিকা। রানার সবচেয়ে ভাল লাগে ওর দেশাত্মবোধ এবং দায়িত্ববোধ।

এবার কিছু অভিযোগ করি। রানার বিপদসীমা বইটাতে 'স্যার' শব্দটাকে প্রতিবারই 'সার' ছাপানো হয়েছে। এবং 'গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র' এই ভলিউমটির বেশ কিছু পৃষ্ঠা অনুপস্থিত।

এর মধ্যে রানার বেশ কিছু বইয়ের প্রচ্ছদ ভাল লেগেছে। 'অন্ধ আক্রোশ' এইমাত্র শেষ করলাম। স্বাস্থ্য দেখে যেটুকু ভাল লেগেছে, পড়ে তার চেয়েও বেশি লেগেছে।

সেবা'র সাথে যুক্ত সব্বাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

প্রথমেই অভিযোগের জবাব: স্যর, স্যার, সার—কোনটিই ভুল নয়। যার যেমন খুশি লিখতে পারে। ইংরেজি উচ্চারণ স ও সা-র মাঝামাঝি, শেষের র উচ্চারিত হয় না। আর সেবা'র যে-কোনও বইয়ে যদি বাঁধাইয়ের দোষে পৃষ্ঠা বাদ পড়ে তাহলে বইটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে আমরা নিজ খরচে বইটি পাল্টে ভাল বই সরবরাহ করি।

সেবা'র বই ভাল লাগছে জেনে আমরা যার-পর-নাই আনন্দিত। আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

হাসান আল বান্না, প্র—মোঃ মনিরুজ্জামান,
সোনালী ব্যাঙ্ক, প্রিন্সিপাল অফিস, সিরাজগঞ্জ-৬৭০০

ক্লাস সেভেন থেকে শুরু করে এ-পর্যন্ত আমি মাসুদ রানার ২৫০ টির মত বই পড়েছি। মাসুদ রানা পড়তে গিয়ে আমি দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হই। আমার ধারণা সব পাঠকের মনেই রানার আত্মত্যাগ,

স্বদেশপ্রেম ও মানব কল্যাণের মনোভাব গভীর ভাবে দাগ কাটে। রানার সৎগুণগুলি সত্যিই অনুকরণীয়।

এজন্য আমি আপনাকেই ধন্যবাদ জানাই, কারণ এ-চরিত্র আপনারই সৃষ্টি।

ধন্যবাদ।

সুমন আহমেদ,

১৩১, ঋষিকেশ দাস রোড, একরামপুর, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

আজ আপনার কনকতরী শেষ করলাম। কিছু কিছু শব্দের বানানে খটকা লেগেছে। ...কামনা করি, রানার মত দেশপ্রেমিক যেন বাংলার ঘরে ঘরে জন্মে। তাহলেই আমাদের অভাবগ্রস্ত, অবহেলিত বাংলাদেশটার উন্নতি হবে। দোয়া করবেন আমাদের বয়সী সব ছেলেই যেন রানার মত দুঃসাহসী, সৎ, নির্ভীক দেশপ্রেমিক হতে পারি।

নিশ্চয়ই দোয়া করব। এদেশের সত্যি এটাই দরকার। ...আর বানানের ব্যাপারে যে খটকা, সেগুলোর বেশির ভাগ ঠিকই আছে। যেমন: স্টীলের বীমে কবির চৌধুরীর নামের আদ্যাক্ষর থাকার কোনও কারণ নেই, ওটা কারখানার নামের আদ্যাক্ষর, আর সাল হচ্ছে ২০০২; কাজেই কে.বি. ২০০২ ঠিকই আছে। রেডিও আর রেডিয়ো দুটোই শুদ্ধ। তেমনি চিনা ও চীনা দুটোই শুদ্ধ; সংসদ অভিধান বলছে: চিনা = চীনার বানানভেদ। বিনকিউলার ও বিনোকিউলার শব্দ দুটির মধ্যে প্রথমটিই শুদ্ধ, তবে দ্বিতীয়টিরও ব্যবহার আছে। আগে আমরা বলতাম ও লিখতাম বাইনোকিউলার, সেই নয়ে ওকারটা এখনও মাঝে মাঝে চলে আসে হাতে।

মোঃ ইলতুতমিশ আকন্দ,

চন্দিয়া, ভবানীগঞ্জ, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।

আচ্ছা, নতুন বইগুলো যখন ভলিউম আকারে বের হয় তখন সে-সব বইয়ের আলোচনা বিভাগগুলো কি ভলিউমের শেষে দেয়া যায় না? দিলে আমরা নতুন পাঠকরা উপকৃত হতাম।

ভলিউমে আলোচনা বিভাগের চিঠিগুলো ছাপা না হওয়ার দুটি কারণ আছে। প্রথমত, দু-তিনটি বই একত্র করে, ছোট টাইপে ছেপে ভলিউম প্রকাশের প্রধান কারণই পাঠকদের সাশ্রয়-অনেক কম মূল্যে তাঁরা দুটি বা তিনটি কাহিনী পাঠ করতে পারছেন। এর সঙ্গে আলোচনা বিভাগ ছেপে কলেবর বৃদ্ধি করা অযৌক্তিক। দ্বিতীয়ত, বেশিরভাগ আলোচনার বিষয়বস্তু ততদিনে এতই পুরানো হয়ে যায় যে টাটকা, তাজা ভাবটা আর থাকে না, তাই আকর্ষণও নষ্ট হয়ে যায়।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই **মানি-অর্ডার যোগে** ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১/৯/'০৩ গুপ্তধনের সন্ধানে **(তিন গোয়েন্দা/ কিশোর থ্রিলার)** **রকিব হাসান**

বিষয়: এবার ভেদ করতে হবে লেজকাটা বাঁদরের রহস্য। কিন্তু কাজটা অতো সোজা নয়। শুরুতেই পেছনে লেগে গেল শত্রু। শুরু হলো গুপ্তধনের সঙ্কেত লেখা কাঠের চাকতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। প্রথমে পেরু তারপর আর্জেন্টিনায় যেতে হলো তিন গোয়েন্দাকে। ভাঙা মন্দিরে পাওয়া যাবে কোনও সূত্র? পাহাড়ে? মরুভূমিতে? চোরাকারবারীদের সঙ্গে জড়িয়ে গেল ওরা। তৈরি হলো শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। তারপর পেল ওরা মমির সন্ধান। এবার? প্রাচীন সেই ইনকা গুপ্তধনের হদিশ কি বের করতে পারল ওরা?

১/৯/'০৩ কিডন্যাপড **(রিপ্রিন্ট/কিশোর ক্লাসিক)** **রবার্ট লুই স্টিভেনসন/নিয়াজ মোরশেদ**

বিষয়: সাহায্যের আশায় ধনী চাচার বাড়িতে যাচ্ছে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে ডেভিড ব্যালফোর। কিন্তু এ কি? চাচা এবেনেরের নাম শুনে চমকে উঠছে কেন পথচারীরা? কেন সবাই সে বাড়ি থেকে শত শত মাইল দূরে থাকতে বলছে ওকে? কি রহস্য লুকিয়ে আছে সে বাড়িতে? আপন চাচার ষড়যন্ত্রে বন্দী হলো ডেভিড। দাস হিসেবে বিক্রি করার জন্যে ওকে জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমেরিকায়। তারপর? ডেভিড কি মুক্তি পাবে ক্যাপ্টেন হোসিসনের জাহাজ কভেন্যান্ট থেকে? কি করে?

আরও আসছে

৮/৯/'০৩ হরণ	(ওয়েস্টার্ন)	গোলাম মাওলা নঈম
৮/৯/'০৩ নেশা	(রিপ্রিন্ট/অনুবাদ)	স্যার হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড/খসরু চৌধুরী